ভালচার ইজ এ পেসেন্ট বার্ড

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১-৩. চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার 2
৪-৬. স্যালিক ফিরে এলেন 42
৭-৯. হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে 81

১-৩. চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার

০১.

চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ফেনেলের।বালিশ থেকে মাথা তুলে কান পেতে রইলো। কোথায় যেন বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নোঙর পড়ার একটানা শব্দ, কিন্তু এটা তো বিপদ সূচক নয়–তবু কিসের আশঙ্কায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

প্রায় একমাস যাবৎ ফেনেল মৃত্যুর আতঙ্কে বাস করছে। নিঃশব্দে বিছানার নীচে হাত ঢুকিয়ে পুলিশী ব্যাটনটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো সে।

পাশের মেয়েটার ঘুম যাতে ভেঙে না যায় এমন ভাবে ধীরে ধীরে গায়ের চাদর সরিয়ে খাট থেকে নামলো। নিঃশব্দে প্যান্ট এবং রাবার সোলের জুতো জোড়া পরে মারাত্মক অস্ত্রটা হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় ডেকে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। সে লক্ষ্য করলোবজরা থেকে মিটার পঞ্চাশেক দূরে একটা সাম্পান, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে বজরার দিকে। সাম্পানের ওপর চারটে ঘণ্ডামার্কা চেহারার লোক হাঁটু মুড়ে বসে, একজন ধীরে ধীরে দাঁড় বাইছে। বিপদ যে আসছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ডেকের ওপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলো ধীরে ধীরে। কাউকেই সে পরোয়া

করে না। যে কোনো মূল্যে আত্মরক্ষার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। আজ নয়তো কাল ওরা যে তাকে খুঁজে পাবে একথা সে ভালো করেই জানে। মৃত্যুর সে করে না।

সাম্পান ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে আসে। জলেদড় ছেড়ে দিয়ে জলযানটির গতি নিয়ন্ত্রণ করলো দাড়ি, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সাম্পান লাগলো বজরার গায়ে।

হঠাৎ ফেনেল উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগিয়ে এলো। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাতের ব্যাটনটা ঘোরালো প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে। বাতাস কেটে বিদ্যুৎগতিতে চেনটা গিয়ে আছড়ে পড়লো লোকটার মুখে। একটা আর্তনাদ শোনা গেলো।

দ্বিতীয় আরোহীকেও ফেনেল একই ভাবে ঘায়েল করলো। আরও দুজন আরোহী গন্ডগোল বুঝতে পেরে দাঁড় তুলে বাইতে শুরু করে দিল।সাম্পান ধীরে ধীরে বজরা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। ফেনেল চুপচাপ তাদের চলে যাওয়া দেখতে লাগলো।

আর দেরী না করে সে চলে এলো। দরজা ঠেলে শাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। মিমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়, কি হয়েছে লিউ? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

ফেনেল কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ভিজে প্যান্ট ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায় বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। গরম জলের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিমি বিস্রস্ত বেশবাসে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। ফিনফিনেনাইটির আড়াল থেকে ভারী স্তন দুটি ঝুলে রয়েছে। তার সবুজ চোখের দৃষ্টিতে একই সঙ্গে হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে।

মিমিকে দেখে হাত নেড়ে চলে যেতে বললো ফেনেল, শাওয়ার বন্ধ করলো। ঘরে ঢুকে চটপট জামা প্যান্ট পরে নিল। টেবিলের ওপরের বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো ফেনেল, ঠোঁটে ঠেকিয়ে দেশলাই জ্বাললো। মিমিকে বললো, তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

মনে মনে ভাবলো, মেয়েটি দেখতে যেমনই হোক না কেন, এতদিন মেয়েটি তার উপকারেই এসেছে, গত চারসপ্তাহ ধরে তাকে বজরায় লুকিয়ে রেখেছে সে। যাই হোক এখন সে পালাতে চায়। একবার বেরিয়ে পড়লে আর কতক্ষণ লাগবে মিমিকে ভুলতে।

মেয়েটি কিন্তু তাকে একের পর এক প্রশ্ন করেই চলেছে। হঠাৎ সে ফেনেলের হাত দুটি ধরে বললো, না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না, কিছুতেই না। ফেনেল একরকম ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলো রিসিভারের দিকে। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে তিনটে। জেসি? আমি লিউ বলছি, লিউ ফেনেল। কুড়ি পাউন্ডের একটা কাজ আছে। গাড়িটা নিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিংস রোডের ক্রাউন পাব-এ চলে এসো, যেন এদিক ওদিক না হয়।

মিমি সামনে এসে দাঁড়ালো, ফেনেল তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ওপরের তাক থেকে একটা চায়ের কেটলি নামিয়ে নিল, মিমি উদ্ভ্রান্তের মতো এসে ফেনেলের হাত চেপে ধরল।

ফেনেলের চোখ দুটি জ্বলে উঠলো। সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো ক্রোধ সম্বরণ করতে। বললো, কেন অনর্থক ঝামেলা বাড়াচ্ছো, টাকাপয়সার আমার এখন খুব দরকার। পরে তোমাকে সব শোধ করে দেবো।

না, পারবে না তুমি। মিমি ডান হাত মুঠো করে ফেনেলের গাল লক্ষ্য করে চালালো এক ঘুষি। ফেনেল কোন প্রকারে ঘুষিটা এড়িয়ে মিমির চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি বিশ পাউন্ড ঘুষি চালালো। নোটের বান্ডিল, একগাদা খুচরো পয়সা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মিমি চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান হারালো, ফেনেল আর দেরী না করে নীচু হয়ে সমস্ত টাকা পয়সা, নোটের বান্ডিল পকেটে পুরে পুলিশ ব্যাট হাতে দরজা খুলে এলো বাইরের ডেকে।মিমির দিকে একবারও ফিরে তাকালো না।

বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কনকনে বাতাস বইছে। এক ছুটে কাঠের পাটাতন বেয়ে সে এসে উঠলো পাড়ে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ় মুষ্টিতে ব্যাটনটা চেপে ধরে হাঁটতে লাগলো বড় রাস্তার দিকে।

দূর থেকে জেসির মরিস গাড়িটা দেখা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছুটে গিয়ে পেছনের দরজা, খুলে গাড়িতে উঠে বসলো সে। জেসি লক্ষ্য করলো ফেনেলের চোখের হিংস্র দৃষ্টি।

দশ মিনিটের মধ্যে জেসির ডেরায় গিয়ে দুজনে ঢুকলো। আলো জ্বাললো, কাবার্ড খুলে এক বোতল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর দুটো গ্লাস এনে রাখলো জেসি টেবিলের ওপর। বোতল খুলে গেলাস ভর্তি করে পানীয় ঢাললো।

ব্যক্তিগত জীবনে জেসি এক রেসের কেরানী। বিশেষ করে নীচের মহলের লোকজনদের নিয়েই এই সব কাজ। ফেনেলের সঙ্গে তার পরিচয় পারমা জেলে। এক সাঙাতের কাছে সে শুনেছে, ফেনেল চুকলি খেয়েছে পুলিশের কাছে। তার কাছে খবর পেয়ে পুলিশ মোয়রানির পাঁচ পাঁচজন সাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। মোয়রানি ক্রোধে ফেনেলের মৃত্যু পরোয়ানা জারীকরেছে, এই অবস্থায় তাকে সাহায্য করার অর্থ বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া।কিন্তু কুড়ি পাউন্ডের লোভটাও তো কম নয়।

ফেনেল মিমির নোটের বান্ডিল পকেট থেকে বের করে দুখানা দশ পাউন্ডের নোট জেসির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো যে, সে জেসির ডেরায় দুদিন থাকতে চায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেসী রাজী হলো।

.

এক সপ্তাহ আগে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন চোখ এড়ায়নি গ্যারী এডওয়ার্ডস্-এর। একজন অভিজ্ঞ হেলিকপ্টার পাইলট প্রয়োজন, বেতন আশাতীত।

গ্যারী অভিনব কিছু করতে চায় সুতরাং চাকরির লোভে টনিকে কিছু না জানিয়েই সে একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল।

গ্যারী এডওয়ার্ডস, লম্বা, শক্ত-সমর্থ চেহারার যুবক।বয়স ঊনত্রিশ। গ্যারীর চেহারার মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে মেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তার ওপর। টনি হোয়াইট এর সঙ্গে তার পরিচয় কালো ডোভার ফেরী জাহাজে। দুজন ফরাসী ডিটেকটিভ এসেছিলো তার সঙ্গে জাহাজ ঘাটা পর্যন্ত। অবশেষে জাহাজ ছাড়লো। গ্যারী ডেক থেকে সোজা গিয়ে ঢুকলো জাহাজের প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পানশালায় দীর্ঘ তিন বছর পর এই প্রথম প্রাণভরে মদ খেল। টনি পানশালার উঁচু টুলে বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিলো সিঙ্গানোর গেলাসে। তার বয়স বাইশ। চোখে পড়ার মতোই তার চেহারা। গ্যারী যে অভিবাদন করবে এ আর বিচিত্র কি!

এদিকে গ্যারীকে দেখে রক্তে ঝড় বয়ে গেলো টনির। শরীরের প্রতিটি কোষে যেন যৌবন টগবগ করছে। গ্যারীকে পাওয়ার জন্যে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম।

হঠাৎ গ্যারীর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। মেয়েদের এসব কায়দা-কানুন তাঁর নখদর্পণে। গ্যারী গেলাসে চুমুক দিয়ে টনির দিকে এগিয়ে গেলো। মৃদু হেসে বললো, আপনাকে জানতে ভারী ইচ্ছা করছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়তে এখনও এক ঘন্টা দেরী, ততক্ষণের জন্য বরং একটা কেবিন ভাড়া করা যাক।

প্রস্তাবটা টনির ভারী মনোমতো হলো। তারপর বন্ধ কেবিনের মধ্যে দুজনে দুজনকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনলো, পরিতৃপ্তির আনন্দে দুজনের মনই পরিপূর্ণ। জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনের এক ফাঁকা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দুজনে পাশাপাশি বসলো। টনি জানালো অন্য কোথাও না থেকে গ্যারী যেন তার ফ্ল্যাটেই থাকে। গ্যারী ভাবলো সেটা মন্দ নয়। সেই

থেকে সে টনির কাছেই রয়ে গেছে। শুধু একটা চাকরী এখনও তার জুটলো না। চাকরীর জন্য তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

কফি শেষ করে গ্যারী উঠে দাঁড়ালো দরজা খুলে বাইরে এসে চিঠির বাক্সে একটা চিঠি তার চোখে পড়লো।

ডেইলি টেলিগ্রাফ প্রকাশিত এস, ১০১২ বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের উত্তরে তার দরখাস্তের ভিত্তিতেই তাকে ডাকা হচ্ছে।

চিঠি হাতে সে ঘরে ঢুকলো। টনি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। পাতলা নাইটিটা কোমর পর্যন্ত উঠে বে-আবু হয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে।

গ্যারীর ধাক্কায় ত্রস্তে উঠে বসলো টনি। গ্যারী তাকে আলিঙ্গন করে বললো একটা চিঠি। এসেছে তার নামে। গ্যারী ডেইলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে তার দরখাস্ত করা, এই চিঠি আসা সব ব্যাপারটাই বললো। ঠিকানাটা শুনে লাফিয়ে উঠলো টনি। রয়্যাল টাওয়ার্স। সে তো হাল আমলের সবচেয়ে নামী এবং দামী হোটেল। যেন বস্তা বস্তা সোনা, দানা, হীরে জহরতের গন্ধ ভেসে আসছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ গ্যারী পৌঁছে গেল রয়্যাল টাওয়ার্সে। দরওয়ানের কথা মত লিফটে চড়ে এগারো তলায় পৌঁছে সাতাশ নম্বর সুইচ খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। বন্ধ দরজায় ধীরে ধীরে টোকা মারলো সে। দরজা খোলাই ছিল। ছিমছাম সাজানো ঘর, ডিস্কের পেছনে বসে একটা মেয়ে। তার সামনে তিনটে টেলিফোন, একটি টাইপ মেশিন,

একটি টেপ রেকর্ডার। মেয়েটিকে দেখে অবাক হলো গ্যারী। মনে হলো যেন রক্তমাংসের মেয়ে নয় একটা যন্ত্র।

চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি মিঃ এড়ওয়ার্ডস? যন্ত্রটায় একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। মেয়েটি উঠে এগিয়ে গেল একটা দরজার দিকে। পেছনে পেছনে এলো গ্যারী। ঘরের ভিতরে গ্যারী প্রবেশ করলো।

দরজার সোজাসুজি বিরাট একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন এক মোটাসোটা, ছোটখাটো চেহারার ভদ্রলোক। মুখে তার জ্বলন্ত চুরুট, হাত দুটি টেবিলের ওপর স্থির করা। চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী। পায়ে পায়ে ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল গ্যারী। স্যালিক হাত তুলে একটা চেয়ার দেখালেন বসার জন্য। তারপর গ্যারীর দরখাস্তটা হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন আর বললেন, নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে বাজে কথা একগাদা লিখেছেন। কল্পনা শক্তি দেখছি বেশ প্রখর।

গ্যারীর চোয়াল শক্ত হলো, ঠিক বুঝতে পারলো না উনি কি বলতে চাইছেন।

একটা সোনার অ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়লেন স্যালিক, পড়ে আমার বেশ মজা লাগছিল বানানো মিথ্যা গল্প। লোক লাগালাম সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য। আপনি গ্যারী এডওয়ার্ডস বয়েস উনত্রিশ। জন্ম আমেরিকার ওহিওতে। আপনার বাবার পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা ছিল। লেখাপড়া শিখে আপনি বাবার ব্যবসাতে লেগে পড়লেন, মোটর গাড়ি সম্বন্ধে বেশ ভালো জ্ঞান আহরণ করলেন। বিমান চালানো শেখার একটা সুযোগ আপনার হলো। পাইলট হতে বেশী দেরী হলোনা। টেক্সাসের এক তৈল ব্যবসায়ীর

বিমান চালকের কাজ পেলেন আপনি। ধীরে ধীরে টাকা বাড়ালেন আপনি এবং স্মাগলারদের দলে ভিড়ে গেলেন।

মেক্সিকোর লোকেদের হয়ে আমেরিকায় স্মাগল করার কাজ।কদিন পরে চোরাই চালানকারী বনে গেলেন। শুরু করলেন নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসা। লোভের বশবর্তী হয়ে একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা চলাকালীন আপনারই একজন সাকরেদ হেলিকপ্টারটি নিয়ে পালালো। সেটা সে বিক্রি করে সেই টাকা জমা রেখে দিল আপনার অ্যাকাউন্টে। তিন বছর জেলের ঘানি টানার পর বেরিয়ে এসে সেই টাকাটা তুলে নিলেন। ফ্রান্সের পুলিশ এসে তুলে দিয়ে গেল আপনাকে জাহাজে। আপনি সোজা চলে এলেন ইংল্যান্ডে।

স্যালিক চুরুটটা অ্যাসট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে দিয়ে গ্যারীর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আপনার অতীত জীবন সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আগ্রহ শুধু দুটো ব্যাপারে– এক, আপনার পাইলটের লাইসেন্স আছে এবং দুই আপনি হেলিকপ্টার চালাতে জানেন। আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। আপনার মতো লোককেই তো আমি খুঁজছিলাম। গ্যারী চেম্বারে বসেতার পকেট থেকে পাইলট লাইসেন্স, প্রশংসা পত্র ইত্যাদি বার করে স্যালিকের দিকে এগিয়ে দিল।

স্যালিক একনজরে দেখে বললেন, এতেই হবে। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট তুলে নিলেন, তারপর গ্যারীর দিকে চেয়ে বললেন–এমন কোন কাজ যদি আপনাকে করতে বলা হয় সেই কাজ কি মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আপনি করতে রাজী হবেন? পারিশ্রমিকটা কিন্তু খুব আকর্ষণীয়। কাজটি তিন সপ্তাহের। সপ্তাহে তিন হাজার

ডলার ফী। তিন সপ্তাহ পর মোট নহাজার ডলার হাতে আসবে আপনার। কাজের ঝুঁকি কিছুটা থাকলেও পুলিশের ঝামেলা হবার– সম্ভাবনা নেই। গ্যারী জানতে চাইলো ঝুঁকিটা কিসের?

এই ধরুন বিপক্ষের লোকেদের নিয়ে। তা সব কাজেই একটু ঝুঁকি থাকে। মানুষের জীবনটাই হাজার ঝুঁকি, হাজার ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়।

গ্যারী জানতে চাইলে তাকে এখন কি করতে হবে। স্যালিক জানালো আজ রাতে সব কিছু জানানো হবে, তবে কাজটা একান্তই গোপনীয়, পাঁচ কান হলে অসুবিধে আছে।

গ্যারী উঠে দাঁড়ালো। ডেস্কের মেয়েটি উঠে এসে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

ঠিক রাত নটায় গ্যারীকে মিঃ স্যালিকের ঘরে ঢুকিয়ে দিল সেই মেয়েটি। ঘরে আরো দুজন লোক বসে সিগারেট টানছে। চেয়ার টেনে বসলো সে। ভিতরের দিকে একটা দরজা খুলে স্যালিক প্রবেশ করলো। ডেস্কের ওধারের চেয়ারে বসে তিনজনের দিকে তাকালেন। তারপর পরিচয় পর্ব শুরু করলেন।

ইনি মিঃ গ্যারী এওয়ার্ডস, হাতের জ্বলন্ত চুরুটটা দিয়ে দেখালেন তিনি গ্যারীকে। পেশায় পাইলট, মোটর গাড়ী বিশারদ। চোরাই চালান করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন বছর কাটিয়ে এসেছেন ফরাসী জেলে। স্যালিক এবার দেখালেন গ্যারীর বয়েসী লোকটিকে, ইনি মিঃ কেনেডি জোন্স। শিকারের দল নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করা এই ছিল ওঁর কাজ। দুর্ভাগ্যবশত মিঃ জোন্সকেও একবার ঘানি টানতে হয়েছে প্রিটোরিয়া জেলে। স্যালিক এবার দেখালেন তৃতীয় ব্যক্তিটিকে। ইনি হলেন মিঃ লিউ ফেনেল। সিন্দুক

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ভাঙতে পাকা ওস্তাদ। ইনিও যথারীতি বিভিন্ন সময়ে কয়েক বছর জেল খেটেছেন। তিনজনের মধ্যে একটা ব্যাপারে বেশ মিল আছে তিন জনেই একবার না একবার জেলের ঘানি টেনেছেন। কেউ কোনো কথা বলল না। স্যালিক এবার নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একট খাম বের করে তার ভিতর থেকে একটা ছবি নিয়ে ফেনেলের হাতে দিলেন। ছবিটা মধ্যযুগের একটা আংটির–ছোট নেগেটিভ থেকে বড় করা হয়েছে। প্রত্যেকেই একবার করে ছবিটা দেখে নিলেন।

স্যালিক বলতে শুরু করলেন যে এবারে আমরা কাজের কথায় আসবো। এই ছবিটা হলো একটা আংটির যেটি সিজার বার্জিয়া তৈরী করেছিলেন। ইনি হলেন সেই লোক যিনি সকলকে বিষ দিয়ে মারতেন। বিষ প্রয়োগের পদ্ধতিটা ছিল রীতিমতো অভিনব। পনেরশ এক সালে বার্জিয়ার আঁকা নক্সা দেখে এক অজ্ঞাত স্বর্ণকার এই আংটিটি তৈরী করে। এই আংটির গঠন প্রণালী এমনই অদ্ভুত যে ছোট এক হীরের আড়ালে এক সংকীর্ণ স্থানে ভরা থাকতো বিষ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটা ছুঁচের মধ্যে দিয়ে সেই বিষ চলাচলের পথ ছিল। বার্জিয়া যখন কোন শত্রুকে শেষ করার কথা ভাবতেন আংটিটা আঙুলে পরে হীরেগুলোকে ঘুরিয়ে হাতের তালুর দিকে এনে উল্টে দিতেন হীরের মুখটাউঁচটা চলে আসতো ওপরে। তারপর সেই আংটি পরা হাতে করমর্দন করতেন শত্রুর সঙ্গে করমর্দনের সময় শত্রুর হাতে সঁচটা বিধে যেত। রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে যেত। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শত্রুর মৃত্যু হতো।

গত চারশো বছর আংটির ইতিহাস অবলুপ্ত। অবশেষে, কিভাবে যেন আংটি ফ্লোরেন্টাইন এর এক ব্যাঙ্ক মালিকের হাতে এসে পড়ে। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর আংটিটা নিলাম হয়ে গেল। আমি আংটিটা কিনলাম। পরে শুনলাম আমার এক মক্কেল বার্জিয়া সম্পর্কিত

প্রাচীন ঐতিহাসিক বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করছেন। আমি আংটিটা তাকে বিক্রি করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আংটিটা চুরি হয়ে গেল। আমি খবর পেয়ে লোক লাগিয়ে অনুসন্ধান চালালাম। আমার মক্কেলের ইচ্ছা যেভাবে তোক আংটিটা তার চাই। আমি কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি এক শিল্প সংগ্রাহকের কাছে আংটিটা আছে। আপনাদের তিনজনকে আমার সেই কারণেই প্রয়োজন। আংটিটা আপনাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। স্যালিক আরো বললেন যে, আংটিটা এখন যার কাছে আছেতিনি একজন ধনকুবের। পৃথিবীর তাবৎমূল্যবান শিল্প-সম্মত জিনিসপত্র সংগ্রহের এক অদ্ভুত বাতিক তার ন্যায় অন্যায় বোধ তার বিন্দু মাত্র নেই। একদল ভাড়া করা শিল্পী চোর আছে তাঁর। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সংগ্রহশালা থেকে তাঁরা কিছু না কিছু হাতিয়ে দিয়েছে তাকে।

গ্যারী জানতে চাইলো-মিউজিয়ামটা কোথায়? ঠিক বাসুতোল্যান্ড এবং নাটালের সীমান্ত বরাবর একটা জায়গায়–ড্রাকেন্সবার্গ পাহাড়ের কাছাকাছি।

জোন্স হঠাৎ বলে বসলো-আপনি কি কালেন বার্গ-এর কথা বলছেন?

–চেনেন আপনি তাকে?

–শুধু আমি কেন সাউথ আফ্রিকার সকলেই তাকে চেনে।

–বেশ, তাহলে আপনি তার সম্বন্ধে যা জানেন বলুন।

জোন্স একমুহূর্ত ভেবে বলতে শুরু করলো যা বলছি সবই আমার শোনা কথা। কালেনবার্গকে আমি চোখে দেখিনিতার বাবাকে আমি চিনতাম। ভদ্রলোক ছিলেন প্রথম

মহাযুদ্ধের সময় জার্মান প্রত্যাগত এক রিফিউজী। জোহান্সবার্গে এসে তার ভাগ্য ফিরে গেল। এক স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠলেন। ষাট বছর বয়সে স্থানীয় এক মেয়েকে বিয়ে করেন। কালেনবার্গ-এর জন্ম হয়। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর সে বাবার মতোই চতুর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন হলো। সুবিশাল তার জমিদারীতে ঢুকতে চেষ্টা করা আর দুআঙুলের চাপে ঝিনুক খুলতে চেষ্টা করা একই রকম অসম্ভব কাজ।

স্যালিক জানালেন, একটি কথা মিঃ জোন্স আপনাদের বলেননি সেটি হলো কালেনবার্গ পঙ্গু চলাফেরা করতে পারেনা। তবু সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভারী লোভ তাঁর। দুর্গ যতই সুরক্ষিত হোক, উপায় আমি একটা বের করেছি।

–ট্রয়ের ঘোড়ার মতো কাজ করার জন্য একটি মেয়েকে সংগ্রহ করেছি। সেও আপনাদের সঙ্গে যাবে।

স্যালিক কথা বন্ধ করে টেবিলের ওপরের একটা বোতামে চাপ দিলেন। একটু পরে পেছন দিকের দরজা খুলে একটি মেয়ে প্রবেশ করলো। তার চেহারা মাদকতাময়, তিলোত্তমার মতো অপরূপা, মৃদু পদসঞ্চারে স্যালিকের পাশে এসে দাঁড়ালো।

.

০২.

আর্মো স্যালিক দশ বছর আগে নিতান্তই এক স্বল্পবিত্ত, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ ছিলেন। অবশেষে কি ভেবে এক দিন ইজিপ্টের খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিয়ে

বসলেন–যে কোন ধরনের গোলমেলে কাজ উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি করতে রাজি আছেন।

দিন কয়েক পর একটা জবাব এলো। কাজটা গোলমেলে হলেও অসম্ভব নয়। আরবের এক রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন তেল কোম্পানীর সঙ্গে আমেরিকান এক তেল কোম্পানীর ভবিষ্যৎ চুক্তি সম্পর্কিত একান্ত গোপনীয় একটি খবর সংগ্রহ করতে হবে। বুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজে নেমে পড়ে স্যালিক দশ হাজার ডলার আয় করলেন। বরাত খুলে গেল স্যালিকের। সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে লন্ডনে অফিস খুলে বসলেন। একে একে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠলো। স্থায়ী চাকুরে তার কাছে মাত্র দুজন। এক নাটালিনরম্যান, রিসেপশনিস্টএবং তার ব্যক্তিগত সহকারী,দুইজর্জ শেরবর্ণ, তার একান্ত সচিব ও ভৃত্য।

কিন্তু অসুবিধা হলো অন্যদিকে। এমন এমন কাজ আসতে লাগলো যেগুলো ঝামেলার কাজ। তিনি ঠিক করলেন একটি মেয়েকে স্থায়ীভাবে রাখা যত জটিল হোক না কেন, কাজ হাসিল করতে মেয়েদের জুড়ে নেই। সুতরাং স্যালিক খুঁজতে বের হলেন তেমন একটি মেয়েকে, যাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কাজে আসবে।পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত শহরে ঘোরাঘুরি করলেন তিনি। প্রায় ছমাস পরে এক সুচতুর, বুদ্ধিমতী-সুন্দরী মেয়েকে তিনি পেয়ে গেলেন, নাম গেই। মেয়েটির সঙ্গে একটি চুক্তি হলো, বছরে মাইনে তিরিশ হাজার ডলার। মাইনে এবং কমিশনের টাকা গেঈয়ের অ্যাকাউন্টে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। স্যালিক ভাবলেন তার সারা বছরের আয়ের শতকরা সাতভাগ মেয়েটাকে দিতেই যাবে।

স্যালিক গেইকে নিয়ে লন্ডনে এলেন, আত্মরক্ষার নানারকম কায়দা শেখাতে ভর্তি করে দিলেন নামকরা এক ক্লাবে। একমাস পরে প্রশংসাপত্র নিয়ে ফিরে এলো গেই। স্যালিক ভারী খুশী হলেন, রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেলে এনে তুললেন তাকে। নিজের স্যুইটের পাশে ছোট্ট একটা স্যুইটে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। তবে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলোনা গেষ্ট্রর প্রতিভা যাচাই করার জন্য। দুমাসের মধ্যেই দুটি কাজ নিপুণভাবে করে ফেললো। প্রথম কাজ এক মক্কেলের বিরুদ্ধ পক্ষের কাছ থেকে একটি রাসায়নিক ফর্মুলা সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় কাজ জাহাজ কোম্পানীর এক গোপন খবর এনে শেয়ার বাজারে আর এক মক্কেলের অনেক টাকা লাভ করিয়ে দেওয়া। দুটো কাজই নিপুণভাবে করলো গেই। স্যালিক মনের খুশীতে গেইকে গরমের ছুটি দিলেন। এর পরই এসে হাজির হলো আংটির ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে গেঈর কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন তিনি।

টেলিগ্রাম পেয়ে পরের প্লেনেই উড়ে এলো গেই। স্যালিক বার্জিয়া আংটি সম্বন্ধে আগাগোড়া সমস্তই বুঝিয়ে দিলেন গেইকে। আরও বললেন যে তিনজন পুরুষ তোমার সঙ্গে থাকবে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পেশায় অভিজ্ঞ। তবে কালেন বার্গ লোকটি বড় সাংঘাতিক, একটু সাবধানে থাকবে।

গেঈ স্যালিকের পাশে এসে দাঁড়াতে তিনজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্যালিক তার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রসিকতা করে বললেন, আপনাদের যে ট্রয়ের ঘোড়ার কথা বলেছিলাম, গেঈ ডেসমন্ডই আমাদের সেই ঘোড়া। এবারে কাজের কথায় আসা যাক। আগামী মঙ্গলবার প্লেনে আপনাদের জোহান্সবার্গে যেতে হবে। সেখানে র‍্যান্ডি ইন্টারন্যাশানাল হোটলে আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই করে রেখেছি।মিঃ জোন্স এই অভিযানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে না ওঠা পর্যন্ত আপনারা

হোটেলেই থাকছেন। কালেনবার্গ-এর বাড়ি এবং জমিদারী সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে কিছু খবর সংগ্রহ করেছি আমি। আংটি উদ্ধারের জন্য মিস ডেসমন্ডকে আগে ঢুকতে হবে তাঁর বাড়িতে এবং ঢুকে জানতে হবে বাড়ির রক্ষণভাগ কত শক্তিশালী, মিউজিয়ামটা কোথায়। মিস গেঈ ডেসমন্ড বাড়িতে ঢোকার সময় সাজবে একজন জন্তু জানোয়ারের ছবি তুলতে ওস্তাদ পেশাদার ফটোগ্রাফার। অ্যানিম্যাল ওয়ার্লড পত্রিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি গেঈ ডেসমন্ড এর নামে একখানা পরিচয়পত্র বের করার ব্যবস্থা করেছি। মিঃ এড়ওয়ার্ডস সাজবেন হেলিকপ্টারের পেশাদার পাইলট। কালেনবার্গ-এর বাড়ির লাগোয়া প্লেন নামার বিস্তৃত রানওয়ে আছে। গেঈ এবং মিঃ এডওয়ার্ডস হেলিকপ্টার নামাবেন সেই রানওয়েতে; জানতে চাইলে বলবেন ওপর থেকে দেখে ভালো লাগলো খুব, তাই নেমে পড়লেন, বাড়ির একটা ছবি তোলার ইচ্ছা আপনাদের। ফিরে এসে ছবি সমেত একটা ফীচার কাগজে ছাপাবেন। কালেনবার্গ-এর মিউজিয়ামটি মনে হয় সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত গোপন স্থানে আছে, যেহেতু মিউজিয়ামে অনেক দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য সামগ্রী আছে। ডারবানে আমার একজন লোক বছর আষ্টেক আগে দেখেছিলো কালেনবার্গ-এর নাম লেখা বড় বড় অনেকগুলো কাঠের পেটি জাহাজ থেকে নামলো। সে জানতো কালেনবার্গ সম্পর্কে আমি বহুদিন থেকেই আগ্রহী। গোপনে অনুসন্ধান চালালো সে। জানা গেল, সুইডেনের বলস্ট্রদের কাছ থেকে চালান এসেছে পেটিগুলো। আমার সেই লোকটি বুদ্ধি করে জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে চালানের নকলটাও কিছু টাকাপয়সার বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে। মিঃ ফেনেল, সেই চালানের নকল এবং তার সঙ্গে বাড়ির একটা ম্যাপ আপনাকে দিচ্ছি। চালানের নকল এবং আপনার বলস্ট্রদের সম্পর্কে জ্ঞান–খুব একটা অসুবিধে বোধ হয় হবে না আপনার। একটা খাম তিনি ফেনেলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

আর মিঃ এডওয়ার্ডস, ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালার ওপর দিয়ে যাবার বিমান পথের একটা ম্যাপ আপনাকে দিচ্ছি। ম্যাপটা দেখে আপনি আমাকে জানাবেন যাতায়াতের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে কিনা, আর একটা খাম তিনি এগিয়ে দিলেন গ্যারীর দিকে।

এবং মিঃ জোন্স, আপনি তো কিছু কিছু কাজ আগেই করে এসেছেন, তবু আপনাকে বলি এই অভিযানের সাফল্য কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে। আপনি এবং মিঃ ফেনেল গাড়িতে এগোবেন, মিস ডেসমন্ড আর গ্যারী যাবেন হেলিকপ্টারে।

স্যালিক ড্রয়ার খুলে চারটে খাম বের করে চারজনের দিকে এগিয়ে দিল। প্রত্যেকটি খামে অগ্রিম তিন হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক আছে। কাজ শেষ হলে বাকি ছয় হাজার।

স্যালিক আর একটা চুরুট ধরিয়ে তাকালেন ফেনেলের দিকে। আপনাকে দুটো ব্যাপারে একটু সাবধান করে দেওয়ার আছে। প্রথমত, মিস ডেসমন্ড সম্পর্কে কোন অতিরিক্ত আগ্রহ কখনো দেখাতে যাবেন না। যে মুহূর্তে আমি শুনবো গেঈর দিকে হাত বাড়িয়েছেন আপনি, অমনি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বাহিনীকে সব খবর তুলে দেবো। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে তা হলো কাজটা যে কোন প্রকারে আপনাকে করতেই হবে। খালি হাতে ফিরলেই আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা দপ্তরে আপনার সব গোপন খবর পৌঁছে যাবে। আমি জানি মোয়রানির দলের পাঁচ জনকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য মোয়রানি আপনার পেছনে লেগেছে—খুন না করে আপনাকে ছাড়বে না, খুব সাবধান!

ফেনেল দরজা খুলে বাইরে এলো। ফেনেল চলে যেতে ন্যাটালি টাইপ করা বন্ধ করলো। কান পেতে শুনলো একটু তারপরনীচু হয়ে টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করলো। টেপটা খুলে সরিয়ে রাখলো আলগোছে।

গ্যারী নীচে নেমে হোটেলের টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল টনিকে। টনি যেন বসেই ছিল টেলিফোনের পাশে, রিং হতেই রিসিভার তুললো।

শোনো টনি, গ্যারী বললো, খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার। ঠিক এক ঘন্টার মধ্যে চলে এসো কার্লটন টাওয়ার্স-এর কাছে রিব রুম রেস্তোরাঁয়। ওখানেই সব কথা হবে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলল, ড্রাইভারকে রিব-রুম-এর ঠিকানা বলে সীটে শরীর এলিয়ে দিলো। নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে টনি এলো। দুজনে গিয়ে বসলো একটা নিরিবিলি জায়গায়।

ওয়েটারকে ডেকে দামীদামী একগাদা ভালো খাবারের অর্ডার দিলো গ্যারী। পানীয়রও অর্ডার দিলো।

টনি তাকালো গ্যারীর চোখে, তাহলে চাকরিটা তোমার সত্যি সত্যিই হলো!

না হলে কি! আর এখানে ডিনার খেতে আসতাম?

খাবার এলো টেবিলে। দুজনে খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে গ্যারী টনিকে সমস্ত ব্যাপারটা বললো। ফী বললো তিন হাজার ডলার। মিথ্যে করে বললো গ্যারী।

টনি মুখ নীচু করে সরবতের গেলাসে চুমুক দিল। তার মুখের সেই চপল ভাবটি অন্তর্হিত হয়েছে। দৃষ্টিতে কেমন যেন এক শূন্যতা।

গ্যারী আরও জানালো যে তার সঙ্গে থাকবে এক আমেরিকাবাসিনী ফটোগ্রাফার। একথা শুনে টনির আয়ত দুই চোখের কোণে মুক্তোর মতো জলবিন্দু চিক্ চিক্ করে উঠলো। সে জানতে চাইলো যে, আমেরিকাবাসিনী ফেটোগ্রাফার সুন্দরী কি না। গ্যারী জানালো, সুন্দরী, হ্যাঁ তা বলতে পারো।

টনির চোখে দুঃখের ছায়া নামলো। –গ্যারী, তুমি কি আর ফিরে আসবে আমার কাছে?

একটু ইতস্ততঃ করলো গ্যারী তারপর মাথা নীচু করে বললো, কি জানি বলতে পারি না।

গ্যারীর একখানি হাত দুহাতের মধ্যে তুলে নিলোটনি,বুকের কাছটিতে,দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। মাথা নীচু করে গ্যারীর হাতে চুমু খেতে খেতে সে বললো, আমি ভালোবাসি তোমাকে গ্যারী বিশ্বাস করো খুব ভালোবাসি।

.

জেসির আস্তানা হর্নসি রোডে, ট্যাক্সি চালককে সেদিকে যেতে বলে ফেনেল এলিয়ে রইলো সীটে।

জেসির ফ্ল্যাট বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে নামলো সে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো–যেন বিপদের গন্ধ ভেসে

আসছে। কি মনে করে সিঁড়িতে না উঠে বারান্দার এক প্রান্তে টেলিফোন বুথে ঢুকে ডায়াল করল জেসির ঘরের নম্বর। ফোনটা বেজেই চললল কেউ ধরলো না। এবার সে পুলিসের নম্বর ডায়াল করে বললো শীগগিরই চলে আসুন ভীষণ বিপদ। খুনও হতে পারে। ফোন নামিয়ে রাখলো সে।

বুথ থেকে বেরিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপর গুটিগুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সে সন্তর্পণে রাস্তা পার হলো, অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অসাড় হয়ে একটা গলির মুখে। একটু পরে পুলিশের দুটো গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে।কয়েক মিনিট পর জেসির ঘরে আলো জ্বললো। আরো মিনিট কুড়ি পর দুটো জোয়ানকে হাত কড়া লাগানো অবস্থায় ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে এলো তিনজন পুলিশ, লাথি মেরে তুললো ওদের গাড়িতে। একজন পুলিশ রইলো জেসির ঘরে।

নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকালো ফেনেল, ওদিকের দেয়ালটা চোখে পড়লো। রক্ত দিয়ে দেয়ালে কেউ যেন পিচকারী খেলেছে। রক্তের বন্যা বইছে। পুলিশটা জেসির মৃতদেহের পাশে বসে কি যেন পরীক্ষা করছে।

ফেনেল কি ভাবলো, তারপর একছুটে গিয়ে পড়লো একেবারে পুলিশটার ওপর। কিছু বোঝার আগেই ধরাশায়ী।

শোবার ঘরে ঢুকে ফেনেল তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় উঠে গেল। টান মেরে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে নামলো সমান ক্ষিপ্রতায়। এক লাফে তিন-তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে এলো নীচে।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। বৃষ্টি পড়ছে। এখন ভালোয় ভালোয় কেটে পড়াই ভালো।

দুটো পুলিশের গাড়ি আর একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামলো বাড়ির দরজায়। ফেনেল গলিপথ ধরে এগিয়ে বড় রাস্তায় উঠলো। ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে থামালো। ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললো, রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেল। একটু তাড়াতাড়ি।

হোটেলে স্যালিকের স্যুইটের দরজায় কড়া নাড়লো ফেনেল। একটু পরে দরজা খুলে দিল এক বয়স্ক লোক। ফেনেল দেখেই চিনলো লোকটা জর্জ শেরবর্ণ, একাধারে স্যালিকের একান্ত সচিব ও প্রধান ভৃত্য।

দরজা বন্ধ করে ফেনেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, মিঃ স্যালিক দিন দুয়েকের জন্য বাইরে গেছেন। কি দরকার আমাকে বলুন।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ফেনেল বললো, আমাকে এক্ষুনি এ দেশ ছাড়তে হবে। মহা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি। শয়তানগুলো আমাকে না পেয়ে আমার বন্ধুকে খতম করেছে। পুলিশ এখন সে বাড়িতে। হাতের ছাপ আমার ঘরের সর্বত্র। ব্যাটারা ঠিক ধরে ফেলবে।

শেরবর্ন-এর প্রধান গুণ হলো জরুরী অবস্থায় ধর্মযাজকের মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখা। ফেনেল ছাড়া যে বার্জিয়া আংটি উদ্ধার করা অসম্ভব একথা সে ভালোভাবেই জানতো। ফেনেলকে সে ভেতরের ঘরে চুপচাপ বসতে বলে দরজা বন্ধ করে বাইরে বের হলো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে জানালো যে, ফেনেলকে লিড অবধি নিয়ে যাবার জন্য বাইরে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। হেলিকপ্টারে লিড থেকে তাকে যেতে হবে নো-তুকেতে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে প্যারিসের নরম্যান্ডি হোটেলে, প্যারিস থেকে জোহান্সবার্গে প্লেনে সে যাবে ওরলি পর্যন্ত। সেই ভাবেই তার টিকিট কাটা।

শেরকর্ন আরো বললো যে, এই ব্যবস্থায় আপনার জন্য যা যা খরচ সব বাদ যাবে আপনার ফি থেকে। ফেনেলের হাতে একখন্ড কাগজ খুঁজে দিল সে, সব খুঁটিনাটি এতে লেখা আছে, দেখে নেবেন।

ফেনেল কাগজখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লিফটের দিকে ছুটলো। পাঁচ মিনিট পর ভাড়া করা,একখানা ট্যাক্সি তাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো লিডের দিকে।

.

০৩.

গেঈ, গ্যারী, জোন্স এবং ফেনেল ওরা সব যে যার চলে গেছে। স্যালিক তার ওভারকোট এবং বাইরে বেড়াতে যাবার ছোট ব্যাগটি নিয়ে ন্যাটালির অফিস ঘরে ঢুকলেন। ন্যাটালি মাথা নীচু করে কি যেন করছিলো। পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকালো।

গত প্রায় তিন বছর ন্যাটালী আছে স্যালিকের সঙ্গে। এক এজেন্সির কাছে লোক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্যালিক তার ব্যক্তিগত সহকারী হতে পারে এমন একজন। এজেন্সি যাদের পাঠিয়েছিল, তাদের ভেতর থেকে ন্যাটালিকেই বেছে নিলেন তিনি। স্বভাবতই ন্যাটালির যোগ্যতা অন্যান্যদের থেকে বেশীই ছিল।

ন্যাটালির বয়স আটত্রিশ, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান সে অনর্গল বলতে পারে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া তার বাইরের জগতে কোন টান নেই। স্যালিকের মাঝে মাঝে মনে হয় ন্যাটালি মানুষ নয়, একটা যন্ত্র। ন্যাটালির চোখের দৃষ্টি ভেজা ভেজা, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, চেহারায় মাদকতার চিহ্ন মাত্র নেই। কথা বলার সময় স্যালিক ন্যাটালির চোখের দিকে তাকান না।

–দিন দুয়েকের জন্য বাইরে চললাম মিস নরম্যান, অন্য দিকে তাকিয়ে স্যালিক বললেন, আগামীকাল যখন তোক ঘণ্টা খানেকের জন্য এসে চিঠিপত্র কি আসে না আসে একবার দেখে যাবেন। তারপর আপনার ছুটি। স্যালিক আর না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে যথারীতি এসে ন্যাটালি চিঠির গোছা খুলে বসেছে এমন সময় জর্জ শেরবর্ন এসে তার ঘরে ঢুকলো।

ন্যাটালি এবং শেরবর্ন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেনা।দুজনেই দুজনকে ঘৃণা করে, অবশ্য কাজের সময় আলাদা কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন ব্যাপার নেই।

ন্যাটালিকান পেতে শুনলো ডায়ালের শব্দ। শেরবর্ন কাকে যেন টেলিফোন করছে। সেড্রয়ার টেনে প্লাস্টিকের বড় ব্যাগ খুলে ছোট টেপরেকর্ডারটা এবং তিন রিল টেপ দ্রুত ব্যাগে পুরলো। শেরন তখন টেলিফোনে কথা বলছিল।ন্যাটালি শুনলো, আজ একেবারে একা কেউ নেই এখানে –ইস। একেবারে ন্যাকা খুকীটি আমার–তিনি সোমবার ফিরবেন-হা-হা-আসছ তো তাহলে? ঘৃণায়, বিরক্তিতে ন্যাটালির মন ভরে গেল।

ন্যাটালি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, লিফটের দরজা খুলতে ন্যাটালি লিফটে উঠেনীচে নামার বোতাম টিপলো। দরজা বন্ধ হলো। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরে সে কেনসিংটনে তার চার্চ স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছলো। চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলো এখন এগারোটা দশ, শনিবার। ব্রানেটকে এখন। ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে তো?

নম্বর ঘুরিয়ে ডায়াল করলো ন্যাটালি। কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে ভরাট, সুমিষ্ট পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এলো, মিস নরম্যন? কি মনে করে? কেমন আছেন?

ন্যাটালির গলা একটু কেঁপে উঠলো, একটু ইতস্ততঃ করলো তারপর খানিকটা জোর দিয়েই বলে ফেললো, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই মিঃ ব্রানেটজরুরী দরকার।

বেশ বেশ, আতিথেয়তার সুর মিঃ ব্রানেটের কণ্ঠে, চলে আসুন তাহলে, এখনই আসুন। ঘন্টাখানেক পরেই আমি বের হবো।

না, আপনি এখানে আসবেন আমার ফ্ল্যাটে, ৩৫-এ চার্চ স্ট্রীটের পাঁচ তলায়, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই। সে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। ক্ষণিকের জন্য সমস্ত রক্ত যেন উঠে এলো তার মুখে। এক অজ্ঞাত ভয় যেন পঙ্গু করে দিল তাকে। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে দিল।

চার্লস ব্রানেট, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ার ম্যান, ঘরে ঢুকলেন, দীর্ঘাকায় শক্ত সবল চেহারার মানুষ। পরনে ধূসর রঙের স্যুট।

–এত জরুরী তলব কিসের মিস নরম্যান? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ন্যাটালির দিকে।

ন্যাটালি শান্ত গলায় বললো, বসুন মিঃ ব্রানেট। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য এখানে আপনাকে ডাকিনি। মিঃ কালেনবার্গ সম্বন্ধে কিছু খবর দিতে পারি।

ব্রানেট বললেন, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ারম্যান তিনি। ম্যাক্স কালেনবার্গ তার মালিক। ব্রানেটের কাছে কালেনবার্গের বরাবর নির্দেশ আছে লন্ডনের এমন সব খবর যা কালেনবার্গের ক্ষতি করতে পারে, তাকে জানাতেই হবে।

এই তত দিন বারো হলো, এক টেলিগ্রাম এসে হাজির নাটাল থেকে

আর্মো স্যালিকের কাজকর্মের বিবরণী চাই, কালেনবার্গ। টেলিগ্রামটা পেয়ে তার টনক নড়লো। কালেনবার্গের ক্ষতি করতে পারে–কি সেই খবর? ভেবে কূল পেলেন না তিনি। কিন্তু এতো সব ভেবে লাভ নেইকালেনবার্গ জানতে চেয়েছেন এটাই বড় কথা। ব্রানেটের কপাল ভালো।দু-এক দিন পরেই এক নিমন্ত্রণ পেলেন–স্যালিকের স্যুইটে ককটেল পার্টিতে যোগদানের সাদর নিমন্ত্রণ। সেই পার্টিতেই তাঁর পরিচয় ন্যাটালি নরম্যানের

সঙ্গে। ন্যাটালির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি বুঝলেন, স্যালিকের এই একান্ত সচিবটির এই ভাবলেশহীন সরল মুখের অধিকারিণী মেয়েটির অবিলম্বে যৌনক্ষুধা নিবারণ একান্ত প্রয়োজন।

ন্যাটালি তার দরকারে আসতে পারে–ওকে দিয়েই তার কাজ হতে পারে। ব্রানেট ন্যাটালিকে বলেছিলেন যে, যখন কোন প্রয়োজন হবে নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবেন। ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ারম্যান আমি। এখানে কাজ করতে এক ঘেয়ে লাগলে বা টাকা পয়সা আরো রোজগারের ইচ্ছে থাকলে আমার সঙ্গে যোগযোগ করতে কোন সঙ্কোচ করবেন না।

বাড়িতে ফিরে ব্রানেট ভাবতে লাগলেন ভালোই হয়েছে, গোপন খবরাখবর যা কিছু একমাত্র ন্যাটালির মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আগে চাই একজন পুরুষ–সর্বগুণ সমন্বিত, একজন শয্যাসঙ্গী–লোলুপ কামোন্মত্ত একজন পুরুষ। এখন প্রয়োজন সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর টম পার্কিস-এর সাহায্য। পার্কি-কে ফোন করে ব্যাপারটা বলে দিলো ব্রানেট। বেলা তিনটে নাগাদ পার্কি-এর ফোন এলো আপনার লোক পাওয়া গেছে। ড্যাজ জ্যাকসন তার নাম। চব্বিশ বছর বয়েস। একটা বাজে হোটেলে গীটার বাজিয়ে পেট চালায়, জ্যাকসনকে দেখে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

পাঁচটা বাজার দশ মিনিট পরে ড্যাজ এসে হাজির হলো। ব্রানেটের মহিলা সেক্রেটারী তাকে নিয়ে গেলেন ব্রানেটের ঘরে।

ড্যাজ ঘরে ঢুকতেই ব্রানেট তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। ড্যাজের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। জ্যাকসন নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তারপর জানতে চাইলে কাজটা কি ধরনের? মালকড়িই বা কত?

ব্রানেট আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলো ড্যাজকে। সব শুনে ড্যাজ বললো আসল কথা ছুকরীটাকে শোয়াতে হবে–এই তো? একশ ডলার চাই আমার। এ ছাড়া ওর যা মাল খসাতে পারবো–সব আমার। ব্রানেট রাজী হলেন এবং ন্যাটালির বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা টাইপ করা একখন্ড কাগজ এগিয়ে দিলেন ড্যাজ-এর দিকে।

ব্রানেট ড্যাজকে জানিয়ে দিলেন যে কাজটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে।

.

জানুয়ারীর এক সূচীতীক্ষ শীতের রাতে অফিসের কাজ সেরে বেরিয়ে ন্যাটালি দেখলো, তার গাড়ির পেছনের একটা চাকা একেবারেই গেছে। শীতও পড়েছে ভীষণ। সেই হাড় কাঁপানো শীতে গাড়ির ঐ অবস্থা দেখে তার কান্না এলো। এই অবস্থায় সে কি করবে ভেবে পেলো না।

অন্ধকারের গা ছুঁড়ে এমন সময় বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘাকায় যুবক।ন্যাটালির গাড়ির চাকার হাওয়া সেই খুলে দিয়ে অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে সে ন্যাটালির দেখা পেলো।

রাস্তার আলোয় ন্যাটালির লম্বা সুঠাম পা দুটি দেখে তার মন্দ লাগলো না। চেহারার গঠনটাও মন্দ নয়। এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ড্যাজ। ন্যাটালির কাছে গিয়ে বললো, দেখে মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছেন। সাহায্যের দরকার নাকি?

হঠাৎ তাকে দেখে ন্যাটালি চমকে উঠলো, ডাইনে বাঁয়ে সেই কানাগলিতে তারা দুজন ছাড়া আর কেউই নেই।

অসহায়ের মত ন্যাটালি বললো, গাড়ির চাকাটা গেছে দেখছি। এমন কিছু নয় অবশ্য, একটা ট্যাক্সি খুঁজছি। সাহায্যের দরকার নেই, ধন্যবাদ!

ড্যাজ এবার আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো, দুজনে এবার দুজনকে দেখলো। ন্যাটালির ফুসফুসের স্পন্দন বাড়লো, কি সুন্দর সুঠাম চেহারা। উত্তেজিত হলো ন্যাটালি, শিরায় শিরায় রক্তের শিহরণে চমকিত হলো তার শরীর।

ড্যাজ বললো, আমি ঠিক করে দিচ্ছি সব, আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, এই শীতে কি বাইরে থাকা যায়

দরজা খুলে ন্যাটালি গাড়িতে বসলো। যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে নতুন চাকা লাগিয়ে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছনে হাত মুছতে মুছতে ড্যাজ বললো, সব হয়ে গেছে–আপনি এবার গাড়ি ছাড়তে পারেন।

ন্যাটালি তার দিকে তাকালো। যুবকটি ঝুঁকে পড়েছে জানলার ওপর, তাকিয়ে আছেতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে। ঐ দৃষ্ঠিতে যেন মনে হয় কোন প্রতিশ্রুতির চিহ্ন আছে।

চোখের থেকে চোখ নামিয়ে হাসলো ন্যাটালি, চলুন না, আপনাকে একটা লিফট দিই গাড়িতে।

ড্যাজ রাজী হয়ে গেল। বিপরীত দিকের দরজা খুলে ন্যাটালির পাশে গিয়ে বসে পড়লো। ড্যাজের কাঁধে কাঁধ লাগলো ন্যাটালির, শরীরে শিহরণ খেলে গেলো তার। উত্তেজনায় উল্লাসে ন্যাটালির হাত কাঁপছিল। ড্যাজ মুচকি হেসে বললো, আপনি তো শীতে কাঁপছেন দেখছি, দিন না, আমি চালাই।

নিঃশব্দে ড্যাজের হাতে চাবি তুলে দিলোন্যাটালি। জায়গা বদল হলোদুজনের, গিয়ারে লেগে স্কার্টটা একটু ওপরে উঠে গেলো।

ন্যাটালি ভাবলো, সারা শরীরের মধ্যে দেখবার মতো তো আমার পা আর উরু দুটো। দেখুক না একটু।

ন্যাটালির মনে সন্দেহ ছিলো, ঠিকমতো গাড়ি হয়তো চালাতে পারবে না ও–হয়তো ঝড়ের বেগে বিপজ্জনকভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে গাড়ি। কিন্তু না, গাড়ি ভালোই চালায় ও–তিরিশ মাইলের বেশী গতিবেগ কখনই বাড়ালো না। অভ্যস্ত নিপুণ হাতে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে গাড়ি চালাতে লাগলো। আবার তার সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো সে, আবার তার কামনা সজীব হয়ে উঠলো।

ঘাড় ফিরিয়ে ন্যাটালির দিকে ড্যাজ হাসলো–সেই মাদকতাময় হাসি। ন্যাটালির কামনা তীব্রতর হলো, মন তার দুর্বল হলো।

গাড়ি ততক্ষণে নাই ব্রীজের ভূগর্ভ রেলস্টেশন পার হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে চার্চ স্ট্রীটে ঢুকে পড়লো। ন্যাটালি আঙুল তুলে দেখালো ঐ যে আমার বাড়ি।

–এই বাড়িটায় থাকেন আপনি? এই বড় বাড়িটায়?

–হ্যাঁ, এই ঢালু রাস্তা ধরে নেমে সোজা গ্যারেজ। একটু ইতস্ততঃ করলো ন্যাটালি, হাত মুখ ধোবেন নিশ্চয়? ড্রিঙ্কস্ একটু–চলুন না ওপরে।

ড্যাজ মুচকি হাসলো, কাজটা সোজা হবে, সে জানতো তাই বলে এত সোজা। হ্যাঁ, হাতমুখ ধুলে তত ভালোই হতো। আলোকিত প্রশস্ত গ্যারেজে গাড়ি ঢোকালো ড্যাজ।

লিফটে পাঁচতলায় উঠলো দুজনে, কেউ কোনো কথা বললো না, কেউ কারোর দিকে তাকালো না। ঘরের দরজা খুললোনাটালি। ছোট্ট, ঝকমকে বসবার ঘরে এসে বললো ড্যাজকে, নিন, কোটটা খুলে ফেলুন। বাথরুমটা ওদিকে।

চারিদিকে তাকিয়ে বলল ড্যাজ, বাঃ ভারী সুন্দর তো! এতক্ষণে ন্যাটালি বুঝে গেছে সুন্দর কথাটার ওপর ড্যাজের বড় ঝোঁক।

বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো ন্যাটালি। ধীরে ধীরে কোট খুললো, স্কার্ট খুললো, কামনা তার হৃদয়ে টগবগ করে ফুটছে, সে কাঁপছে থর থর করে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্যাজ বুঝলল, জল অনেকদূর গড়িয়েছে। দুজনে দুজনের চোখে চোখ রাখলো।কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো।

ড্যাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ন্যাটালির দিকে–শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললো তাকে। আনন্দে, উত্তেজনায় ন্যাটালি কেঁপে কেঁপে উঠলো। আচ্ছন্নের মতো সে অনুভব করলো, ড্যাজ তাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকছে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে শান্তি পেলো। একে একে তার পোশাক খুলে ফেললো ড্যাজ-তপ্তচুম্বনে ভরিয়ে দিলোর্তার নিরাবরণ অঙ্গ। বাধা দিলনান্যাটালি। ড্যাজের হাতে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলো সে।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলড্যাজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলোসুন্দর সাজানোঘর পাশেন্যাটালি উপুড়হয়ে শুয়ে,হাতদুটিতারবুকেরনীচেভাঁজ করা ন্যাটালিকেআর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ড্যাজ। ন্যাটালিকে ডেকে তুললল,বললো। খুব ক্ষিধে পেয়েছে। খাবার কিছু আছে কি?

একটু নড়ে চড়ে চোখ মেলে তাকালো ন্যাটালি, চোখ তাঁর পরিতৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল। এমন তৃপ্তি আগে কোনদিন পায়নি সে। এত দিনে অনাবিষ্কৃত এক দরজা যেন খুলে গেছে তার সামনে। তাড়াতাড়ি উঠে সে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নিঃশব্দে আলমারীর ড্রয়ার খুলে ফেললো ড্যাজ। ড্রয়ারে একটা সোনার সিগারেট কেস, সোনার লাইটার। গয়নার বাক্সে একটা মুক্তোর হার আর দুটো আংটি। একে একে সব কটাই পকেটস্থ করলো ড্যাজ। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে বসবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ন্যাটালি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তাড়াতাড়ি টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেললো। গোগ্রাসে খেলো ড্যাজ। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আগাগোড়া ঘটনাটা ভাবলো ড্যাজ। বেশ ছবির

মতো ঘটে গেলো সব। চেয়ারে বসে ন্যাটালি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখে সেই ভেজা ভেজা দৃষ্টি। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মুখ মুছলো ড্যাজ, বাঃ ভারী ভালো লাগলো, সুন্দর!

তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিলো, তাই না?

ন্যাটালির চোখে চোখ রেখে বললো ড্যাজ, তোমারও তো পেয়েছিলো ক্ষিদে?

ন্যাটালির গাল গোলাপি হলো। সে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো। ড্যাজ উঠে দাঁড়ালো, আজ চলি।ন্যাটালির চোখে জল এলো, তুমি চলে যাবে? থাকবেনা? একটা যন্ত্রণাদলা পাকিয়ে উঠলো তার গলায়, এমন শীত বাইরে–থাকো না আজ।

মাথা নাড়লো ড্যাজ, না থাকা চলবে না, ফিরতেই হবে আমাকে। দরজার দিকে এগোতে লাগলো সে। আবার আবার কবে দেখা হবে আমাদের? কথাগুলো আর্তনাদের মতো ন্যাটালির গলা থেকে বেরিয়ে এলো।

ন্যাটালি কিছু বলার আগেই সে চলে গেলো। দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো। শব্দটা মেঘের গর্জন হয়ে ন্যাটালির মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়লো।

পরদিন সন্ধ্যায় ন্যাটালি আবিষ্কার করলো, তার সিগারেট কেস, লাইটার এবং গয়নাগুলো অপহৃত হয়েছে। সিগারেট কেস আর লাইটারটা তাকে স্যালিক দিয়েছিলো তাঁর জন্মদিনে উপহার। মনে বড়ো ব্যথা পেলো সে, বুঝতে বাকি রইলো না ওগুলো কে

হাতিয়েছে, পুলিশকে • টেলিফোন করে সব জানানোর কথা মনে হলো তাঁর। কিন্তু না, থাক।

দিন পাঁচেক পরে রাত্রিবেলা ন্যাটালি একা ঘরে বসে আছে। দুঃখে, শোকে, বেদনায় সে মুহ্যমান। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে ধরলো।

ড্যাজ বলছি। সেদিন তোমার জিনিসগুলো নিয়ে এসে মোটেই ভালো করিনি, কি করব। টাকার যে বড় দরকার হয়েছিল। ওগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছি। রসিদগুলো তোমাকে দেবো খন–নিয়ে আসবো এখনই?

এসো।

রাত দশটার সময় ড্যাজ এসে পৌঁছলো, একটু রোগা হয়েছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে।

ড্যাজ রসিদগুলো ন্যাটালির টেবিলে রাখলো, আবার বললো, কাজটা আমার উচিত হয়নি, কি করি-বড় বিপদে পড়েছিলাম–টাকার দরকার তাই।

ড্যাজ যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

–যেয়ো না লক্ষিটি, কাতর মিনতি ফুটে উঠলো ন্যাটালির গলায়।

ঘুরে দাঁড়ালো ড্যাজ, তার চোখে অস্থির দৃষ্টি। আরো টাকা চাই। আমায় যোগাড় করতে হবে। এখানে বসে কাটালে আমার চলবে না। তোমাকে তো কিছু বলতে পারবো না, তোমার অনেক নিয়েছি আমি।

ড্যাজ তাকে এক বানানো গল্প শোনালো। আগামীকালের মধ্যেই তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড যোগাড় করতে হবে।

ন্যাটালি অধীর হলো। সে বলে বসলো, আমি তোমাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেবো ড্যাজ, আমি তোমাকে এখনই চেক দিচ্ছি।

এক ঘন্টা পর। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে দুজন। ড্যাজের সঙ্গে সেই দেখার পর ন্যাটালি আবার নিশ্চিন্ত, সুখী। গতবারের চেয়ে এবার আরো ভালো।

মুখ ফিরিয়ে ড্যাজের দিকে তাকালো সে। ড্যাজের চোখে আবার সেই বিষাদ দৃষ্টি।

সে ধীরে ধীরে বলল, কি হলো ড্যাজ?

ড্যাজ বললো, আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে, ডাবলিন-এ যাবো। ড্যানি আমাকে একটা না একটা কাজ ঠিকই জুটিয়ে দেবে। তোমার পঞ্চাশ পাউন্ড-এ হয়তো দুদিন চলবে, তারপর কি হবে? আমার বাবোশোর প্রয়োজন। বারোশ পাউন্ড না হলে আমায় ইংল্যান্ড ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে যেতেই হবে।

ন্যাটালির সম্বিৎ লোপ পাবার উপক্রম হলো। বিছানা থেকে নেমে নাইটিটা পরে নিলো সে। ড্যাজ আড়চোখে তাকালো তার দিকে–তুরুপের তাশখানা ঠিকই চেলেছে সে। চোখে তার চিন্তার ছায়া। ঘরময় পায়চারি করতে করতে কি যেন ভাবলো ন্যাটালি তারপর বিছানায় বসে ড্যাজের চোখে চোখ রাখলো, ড্যাজ, যদি আমি তোমাকে বারোশো পাউন্ড দিই, থাকবে তুমি লন্ডনে?

–নিশ্চয়ই থাকবো। দশদিনের মধ্যেই আমার চাই।

যদি তোমাকে টাকাটা দিই, এখানে এসে থাকবে?

–মনে হয় পিরবোতোমার সঙ্গে থাকতে পারবো।

ন্যাটালি একটানে খুলে ফেললো নাইটি। বিছানায় শুয়ে ড্যাজের গলা জড়িয়ে ধরলো। ড্যাজ অনিচ্ছায় ন্যাটালিকে জড়িয়ে ধরলো।

ন্যাটালির চোখে ঘুম নেই।মন তার চিন্তায় মগ্ন। বারোশো পাউন্ড!তারসঞ্চয় দুশো বাদ দিলেও আরো হাজার পাউন্ড। স্যালিকের কাছে চাওয়া বৃথা। একটা উপায় অবশ্য আছে, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চার্লস ব্রানেটের কথাই বারবার মনে হয়েছে তার। এখানকার বড় বড় ব্যবসায়ে এ পক্ষ ও পক্ষ দুপক্ষেরই গোয়েন্দাগিরির কথা ন্যাটালির অজানা নেই।

পরদিন সকালে আর দেরী না করে ন্যাটালি ফোন করলো ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে।

ব্রানেটকে ড্যাজ আগেই ফোনে সব জানিয়ে রেখেছে। ন্যাটালির ফোন পেয়ে তাই মোটেই অবাক হলেন না ব্রানেট।বললেন, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলে বড়ো খুশী হবো মিস নরম্যান।

তিনটে নাগাদ নাটালি ব্রানেট-এর অফিসে এসে জানালো য়ে এক হাজার পাউন্ডের তাঁর ভীষণ দরকার।

ব্রানেট বললো, মিসনরম্যান, আপনাকে ভেঙে বলার কিছু নেই। আপনার টাকার দরকার আর আমার দরকার খবরের, মিঃ স্যালিকের কাজকর্মের খবর,নাটালের মিঃ ম্যাক্স কালেনবার্গ যে খবরের মূল বিষয়!

ন্যাটালির চোয়ালের হাড় শক্ত হলো। গত কয়েকদিন যাবৎ স্যালিকের টেবিলের টুকরো টুকরো কাগজ থেকে বা শেরবর্ন এর সঙ্গে তার কথাবার্তা থেকে সে বুঝেছে ম্যাক্স কালেনবার্গের বিষয়ে একটা কিছু জরুরী পরিকল্পনা হতে চলেছে।

ন্যাটালি আতঙ্কিত স্বরে বললো, ও ব্যাপারে আপনাকে আমি কোনরকম সাহায্য করতে পারবো না। মিঃ স্যালিকের কাজকর্মের ব্যাপারে আমি নেই, তবে একটা কথা বলতে পারি যে কালেনবার্গ নামে একজনের ব্যাপারে কিছু একটা হতে চলেছে।

ব্রানেট হাসলেন, আমি তাহলে আপনাকে একটু সাহায্য করি। দেখবেন আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে আসবে।

কুড়ি মিনিট পর নাটালি ব্রানেটের কাছ থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ছোট একটি টেপরেকর্ডার, ছরীল টেপ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ছোট মাইক্রোফোন পেলো, মনে রাখবেন, খবরের ওপর টাকা। খবর ভালো হওয়া চাই। হাজার পাউন্ডের দরকার আপনার তাই না? খবর জোগার করুন টাকা পেতে অসুবিধা হবে না।

সেই সাক্ষাৎকারের আটদিন পরে তিনি আজ এসেছেন ন্যাটালির ফ্ল্যাটে। এই তিন দিনব্রানেটের মাইক্রোফোন অনেক কাজ দিয়েছে। ড্যাজ আটদিন হলো ন্যাটালির সঙ্গে আছে–নিত্য নতুন ভাবে-ভঙ্গীতে ন্যাটালিকে সে নিয়ে গেছে চরম পুলকে সাতরঙা এক জগতে।

ন্যাটালি এবার ব্রানেটকে মিঃ কালেনবার্গের খবর শোনাতে আরম্ভ করলো।

মিঃ কালেনবার্গের কাছ থেকে সিজার বার্জিয়া আংটি চুরির পরিকল্পনা করছেন মিঃ স্যালিক, ন্যাটালি বললো, তিনটে টেপ-এ আমি সব ধরে রেখেছি। কাজটা কিভাবে হবে তার খুটিনাটি বিবরণ এবং কে কে সেই কাজ করবে–সব ধরা আছে আমার টেপ-এ।

বার্জিয়া আংটি। ব্রানেট অবাক হলেন, তাহলে এই হলো ব্যাপার! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিস নরম্যান টেপগুলো বাজান দেখি, শুনি।

টেপরেকর্ডার আগেই ঠিক করে রেখে দিয়েছিলো ন্যাটালি, চালিয়ে দিলো এবার। তিন মিনিট রীলের পর সে টেপ বন্ধ করলো, ব্রানেট টেপ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেলেন সাবাস মিস নরম্যান, আপনাকে বলিহারি! শেষ পর্যন্ত শুনে তিনি বললেন,পারিশ্রমিকের যোগ্য কাজই আপনি করেছেন, এই ধরনের আরো খবর দিলে আরো ভালো পারিশ্রমিক

আপনি পাবেন, বিপদের আশঙ্কায় মেসিনটা এবং তিনটে রীল নিয়ে ব্রানেট দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ঘণ্টা তিনেক পর ড্যাজ ফ্ল্যাটে ফিরে এলো। ব্রানেটের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সে জানে তার টাকা পৌঁছে গেছে ফ্ল্যাটে।

এত টাকার মালিক হবার আনন্দে সে এক ঘুড়ির সঙ্গে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে–বিলী ওয়াকারের খুঁড়িখানায় জমাটি মাহিফিল হবে আজ রাতে। মহিফিল সেরে সেই ছুঁড়িটাকে নিয়ে যাবে কিংস রোডের এক নামকরা ক্লাবে, সেখান থেকে একেবারে ওর বাড়িতে বিছানায়। ফ্ল্যাটে ঢুকে ন্যাটালিকে দেখে সে একটু অবাক হলো, বিবর্ণ-বিরস মুখে চেয়ারে বসে কাঁদছে ন্যাটালি।

-কি হলো তোমার? জানতে চাইলো সে।

চোখ মুছে ন্যাটালি সোজা হয়ে বসলো, টাকা পেয়েছি, ড্যাজ।

এতো আনন্দের কথা। মন খারাপের কি আছে? টাকা কোথায়? নিয়ে এসো।

ন্যাটালি তার মুখখানিতে লোভের হীন ছায়া দেখতে পেলোকাবার্ড খুলে নিয়ে এলো নোটের বান্ডিল।

টাকা দেখে চক্ করে উঠলো ড্যাজের চোখ। টাকাগুলোকে লোভীর মতো জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, আদর করলো। ন্যাটালির মন বেদনায় ভরে গেলো। একেই কি সে

ভালোবেসেছে? এই কি তার চোখের সামনে খুলে দিয়েছে তার গোপন পথের দরজা। এতো সে নয়, এ যেন একটা লোভী জন্তু। শেষ নোট কখানা পকেটে পুরতে পুরতে ড্যাজ তার দিকে তাকালো, এখান থেকে ভাগব এবার, কেটে পড়ব।

–তার মানে, টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

–হ্যাঁ, তাই যাবো। ড্যাজ তীক্ষ্ণ, ঘৃণামিশ্রিত চোখে তাকালো তার দিকে, তোমাকে ভালবাসতে যাব আমি? শোনো যাবার আগে তোমাকে কয়েকটা কথা বলে যাই, আর যাকে তাকে বিছানায় ডেকো না যখন-তখন বিপদে পড়বে। মরবে!

আর না দাঁড়িয়ে ড্যাজ চলে গেল। ন্যাটালি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ধীরে পায়ে হেঁটে সে চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো একে একে। সে ভাবতে লাগলো, এমন যে হতে পারে আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আগাগোড়া আমি তো মরীচিৎকার পেছনে ছুটেছি।

আবার একা–নিঃসঙ্গ রাত্রি যাপনের সেই নিঃসীম বেদনা। আমি শুধু নিজেকেই ঠকাইনি, ঠকিয়েছি আমার অন্নদাতা স্যালিককেও। কেন ঠকালাম-ড্যাজের জন্য, তাকেই যখন পেলাম না, বেঁচে থাকার আর কি অর্থ তাহলে? সে রান্নাঘর থেকে তরকারী কাটার ছুরিটা হাতে নিলো তারপর বাথরুমে ঢুকে বাথটবের কল খুলে দিলো। জলে তার গলা পর্যন্ত ডুবে গেলো। এরপর দাঁতে দাঁত চেপে বাঁ হাতের কব্জির শিরায় ছুরি টানলো সে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো একবার। রক্ত বের হতে লাগলো গল গল করে। জলের রঙ প্রথমে ফিকে, তারপর লাল, তারপর ঘন লাল হলো, চোখ বুজলো ন্যাটালি।

কল্পনায় ভেসে উঠলো ড্যাজের সুন্দর মুখ, তার কোঁকড়া একমাথা চুল, তার সুঠাম-দীর্ঘ অবয়ব।

ন্যাটালির প্রাণবায়ু সেই মধুর স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

৪-৬. স্যালিক ফিরে এলেন

০৪.

সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় স্যালিক ফিরে এলেন তার স্যুইটে। ডেস্কে বসতে না বসতে শেরবর্ন-এর মুখে শুনলেন ফেনেলের প্যারিসে যাবার ইতিবৃত্ত। শুনে রাগে তার গা জ্বলে গেল। সকাল থেকেই তার মেজাজটা খারাপ। তবুও ভালো এখনও একটি খবর তিনি শোনেন নি যে বার্জিয়া আংটি চুরির আগোগোড়া খসড়াটা টেপবন্দী অবস্থায় ততক্ষণে ম্যাক্স কালেনবার্গের ডেস্কে পৌঁছে গেছে, শুনলে হয়তো তিনি হার্টফেল করতেন।

নটার মিটিংটা বিরক্তিতেই শেষ করলেন তিনি। গেঙ্গি, গ্যারী এবং জোন্সের কাছে ব্যাখ্যা করলেন, ফেনেলকে কেন এখান থেকে পালিয়ে প্যারিসে গিয়ে উঠতে হয়েছে। তিনি বললেন, মিঃ ফেনেল চলে যাওয়ার ফলে একটু অসুবিধাই হয়েছে আমাদের। কলেনবার্গের নিরাপত্তা বিষয়ে তার কাছে অনেক কিছু জানার ছিলো। র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে তার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র খুঁটিনাটি সব কিছু জেনে নেবেন তার কাছ থেকে। আজ রাতে এখান থেকে রওনা হয়ে কাল সকালে আপনারা পৌঁছবেন জোহান্সবার্গ। একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বললেন, ফেনেল একটা দাগী আসামী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। সাবধানে থাকবেন সকলে। কাজটা ওকে ছাড়া সম্ভব নয় তাই ওকে দলে নেওয়া। গ্যারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস ডেসমন্ডকে নিয়েই যা চিন্তা, একটু নজরে রাখবেন। ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

–আপনাদের যাত্রা শুভ হোক, শেরবর্ন-এর কাছে টিকিট এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি পাবেন। আজ এই পর্যন্তই থাক। তিনজনকে বিদায় দিয়ে স্যালিক ডেস্কের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেদিনের ফিরিস্তি লেখা কাগজ তার চোখে পড়লো না। এমন ভুল তো ন্যাটালি কখনো করে না। তিনি আরো অবাক হলেন যখন শুনলেন যে ন্যাটালি আসেনি। গত তিন বছরে যে মেয়ে একদিনও কামাই করেনি আজ তার হলোটা কি?

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। শেরবর্নকে ধরতে বলে কাজে মন দিলেন তিনি কে বলছেন আপনি–অ্য।- শেরবর্ন এর অবাক স্বর শুনে চোখ তুলে তাকালেন স্যালিক। ফোনের ওপাশ থেকে কিছু একট শুনে শেরবর্ন হতভম্ব হয়ে পড়েছে বোঝা গেল। তার মুখের রঙ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে।

শেরবর্ন রিসিভারের মুখে হাত চেপে স্যালিকের দিকে তাকালো, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্জেন্ট গুডইয়ার্ড, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

স্যালিক চিন্তিত হলেন। শেরবর্নকে, বললেন, ওকে আসতে বলে দাও। কিছুক্ষণ পর করাঘাতের শব্দে সুইটের দরজা খুলে শেরবর্ন মুখোমুখি হলো সার্জেন্ট গুডইয়ার্ডের। সার্জেন্ট স্যালিকের অফিস ঘরে বসলেন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্যালিকের দিকে।

স্যালিকের মনে উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ন্যাটালি নরম্যান আপনারই একজন কর্মচারী, তাই না মিঃ স্যালিক?-অবাক বিস্ময়ে ঘাড় নাড়লেন স্যালিক, হা, কিন্তু আজ তিনি আসেননি। কি ব্যাপার বলুন তো?

শনিবার রাতে মারা গেছেন তিনি, গুডইয়ার্ড পুলিশী কেতায় বললেন, আত্মহত্যা করেছেন।

আতঙ্কের একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়ল স্যালিকের চোখেমুখে। মৃত্যুকে তিনি বড় ভয় পান। এখন তার মাথায় চিন্তা এসে গেল যে তার ব্যক্তিগত কাজকর্ম কিভাবে চলবে? ন্যাটালির মৃত্যুটা তার কাছে কিছুই নয়। আসল ব্যাপারটা তিনি এর মধ্যেই ন্যাটালিকে একটু বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন।

গুডইয়ার্ড স্যালিককে বললেন, ন্যাটালির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্যেই এখানে আসা। আশা করি এ ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। স্যালিক চুরুটে অগ্নিসংযোগ, করতে করতে বললেন, দুঃখিত মিঃ গুডইয়ার্ড। মিস নরম্যান বা তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, কাজকর্মে তাঁর মতো চটপটে মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। মেয়েটির স্বভাব ছিল নম্র আর ব্যবহার ছিল খুব মিষ্টি।

ওভারকোটের পকেট হাতড়ে গুডইয়ার্ড একটি ছোট্ট বস্তু বের করে রাখলেন স্যালিকের টেবিলে, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা?

নিতান্তই সাধারণ একটা পেপার ক্লিপ, একগোছা কাগজপত্র একসঙ্গে আটকে রাখার কাজেই ব্যবহৃত হয়। পেপার ক্লিপের মতো দেখতে হলেও আসলে বস্তুটি এক অমিত শক্তিশালী মাইক্রোফোন। কেবলমাত্র কয়েকটি অনুমোদিত গোষ্ঠী ছাড়া কারুর কাছে

রাখার আইন নেই। এটি সচরাচর গোপন খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্যালিকের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেলো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা।

এটি পাওয়া গেছে মিস নরম্যানের ফ্ল্যাটে। ভাগ্যক্রমে যে ডিটেকটিভের ওপর মৃত্যু তদন্তের ভার ছিলো, তার সজাগ চোখেই এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তিনি এটি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেন। আমার আগমনের কারণ তাই।

–এই মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্য চাই এক বিশেষ ধরনের টেপরেকর্ডার। ক্লিপটি পকেটে ভরে মিস নরম্যানের ডেস্কটি তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। গুডইয়ার্ড আর না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। গুডইয়ার্ডের শীতল দৃষ্টি স্যালিকের মর্মস্পর্শ করলো।

স্যালিক তার চেয়ারে বসে পড়লেন। বড় ঘাবড়ে গেছেন তিনি। রুমাল বার করে ভিজে হাতের তালু মুছলেন। নানা চিন্তা এসে ভিড় করলো তার মাথায়। মাইক্রোফোনটা কি কখনও তার ডেস্কে ছিল। ডেস্কে যদি মাইক্রোফোনটা থেকেই থাকে তবে কোন্টা টেপ হয়েছে আর কোন্টা হয় নি? টেপরেকর্ডারটাই বা কোথায় আছে সেইটাই ভাববার কথা নানা ধরনের চিন্তার স্রোত মাথার মধ্যে আসছে।

.

চার্লস ব্রানেটের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন তার সেক্রেটারী। সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা একখানি টেলিগ্রাম তার হাতে দিলেন। তিনি জানতে পারলেন হনিওয়েল শেয়ারের দর তিনগুণ বেড়েছে। আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। ইনপেক্টর পার্কি-এর স্বর ভেসে এলোদূরাভাসে, ন্যাটালির মৃত্যু সংবাদ নিয়ে।

ব্রানেট বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা দিয়ে কোন স্বর বের হলো না। পার্কি-এর কাছে আরও তিনি জানতে পারলেন যে ন্যাটালির ফ্ল্যাটে নাকি ড্যাজ জ্যাকসন ঘন ঘন যাতায়াত করতো। আশ্চর্যের কথা! ওকি ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়তে পারে?

তেমন সম্ভাবনা নেই। শনিবার রাতেই জ্যাকসন পালিয়েছে। ডাবলিনে গেছে হয়তো। পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ নানা কথা ভাবলেন ব্রানেট। ন্যাটালির ঘরে ফেলে আসা মাইক্রোফোনের কথাও তার মনে এলো। বিকেলটা একেবারেই তর মাঠে মারা গেল।

.

র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশানাল হোটেলের লবিতে বড় ভিড়, হৈ চৈ। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট খুব হৈ চৈ করছে। স্বচ্ছ বর্ষাতিতে শরীর ঢেকে তারা ঘোরাঘুরি করছে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে লিউ ফেনেল পরম বিরক্তিতে সব দেখছিলো। বৃষ্টি সমানে পড়েই চলেছে। প্রায় দেড় দিন সে জোহান্সবার্গে আছে। প্যারিস থেকে জোহান্সবার্গের প্লেনে

ওঠার আগে পর্যন্ত তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ছিলো। এখন সে নিশ্চিন্ত, সম্পূর্ণ নিরাপদ। পুলিশ বা মোয়রানি–উভয়েরই নাগালের বাইরে সে এখন।

আর কিছুক্ষণ পর হোটেলের সামনে এসে থামলো একখানা কালো ক্যাডিলাক। গাড়ি থেকে নামলো ওরা তিনজনে–গ্যারী, গেঙ্গ আর জোন্স। তাঁরা হোটেলে এসে ঢুকলো।

মিনিট দশেক পরনতলায় ফেনেলের স্যুইটে বসবার ঘরে চারজন বসলো টেবিল ঘিরে। সবাই ঠিক করলো যে বিশ্রাম নেবার আগে আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক। ফেনেল বলতে শুরু করলো, শুনুন সকলে, স্যালিকের কাছ থেকে যেনক্সা আমি পেয়েছিতা থেকে ঘটনাস্থলের একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়েছে। আমার বিশ্বাস, কালেনবার্গের মিউজিয়ামটা মাটির নীচে কোথাও আছে।

নক্সায় ছটা টেলিভিশন এবং একটা বিপদজ্ঞাপক মনিটরের উল্লেখ আছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে মিউজিয়ামে মোট ঘরের সংখ্যা ছটা এবং বাড়ির কোথাও না কোথাও মনিটর তদারকি করার জন্য একজন পাহারাদার আছে। এর প্রধান দোষ এই যে, পাহারাদার কখনো ঘুমিয়ে পড়ে, কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে বই পড়তে পারে কিংবা কখন সখনও বাথরুমেও যেতে পারে। আমাদের প্রথমেই জানতে হবে, এই তিনটের কোনটাই সে আদৌ করে কিনা এবং রাতেও সে পাহারায় থাকে কিনা। মিঃ গ্যারীর কাজ এই দুটো বিষয়ে খবর সংগ্রহ করা।

মিউজিয়ামের দরজাটারও উল্লেখ আছে নক্সায়। নিরেট স্টিলের তৈরী দরজা। এই ধরনের দরজা বানায় শুধু বলস্ট্রমরা। দরজায় সাধারণ তালার কোন ব্যাপার নেই–আছে

এক টাইম লক। তালাটি লাগিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ডায়ালে অন্য এক সময় ঠিক করে রাখলেই হলো। পৃথিবীতে একমাত্র বলস্ট্রমরা ছাড়া আর কেউ পারবে না সে তালা খুলতে। অবশ্য টাইম লক খোলার ব্যাপারটা আমার কাছে অতি সহজ ব্যাপার। যত ঝামেলার হলো লিফটাই। কাজটা আমাদের করতে হবে রাতে। আমাদের জানতে হবে রাতে লিফট চালু থাকে কি না, যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে যে রাতে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সব কেটে দেওয়া হয়।

লিফ্ট চালু করার ভার গ্যারীকেই নিতে হবে। আগে থেকে সব দেখেশুনে রাখাই ভালো। আর একটা ব্যাপার আমাদের জানতে হবে সেটা হলো বাড়িতে ঢুকবো কিভাবে দরজা দিয়ে না জানলা দিয়ে। যেমন খবর আপনি জানবেন, তেমন খবর আমাকে জানাবেন। ট্রান্সমিটারে জানালে তবেই সেই ভাবে তৈরী হবো।

ফেনেল গ্লাসে শেষ চুমুক দিল। গেঈ উঠে দাঁড়ালো। নীল পোশাকটা তার গায়ে একেবারে কেটে বসেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, রক্তে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। তিনজনেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

গ্যারী ও জোন্স যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঘণ্টা খানেক পরে জোন্স ফেনেলের ঘরে এলো। এতক্ষণ বসে বসে আরো হুইস্কি টেনেছে। ফেনেল। চোখ দুটি তার জবাফুলের মতো লাল।

জোন্সকে নিয়ে ফেনেল বেরিয়ে পড়লো বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়ার আশায়। বৃষ্টি সমানে পড়েই চলেছে। মাথা নীচু করে দৌড়ল দুজন বৃষ্টির মধ্যে। প্লীনস্ট্রীটে স্যাম জেফারসনের গ্যারেজ কাছেই। স্যাম তাদের দেখে অভ্যর্থনা জানালো।

স্যাম জোন্সকে বললো, যা যা বলেছিলে সবই যোগাড় করে রেখেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে জো আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

ফেনেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, সব আয়োজনই আপনি করে ফেলেছেন দেখছি। নিজেদের টুকিটাকি ব্যাগটা নিলেই চলবে তাহলে।

বৃষ্টি একটানা পড়েই চলেছে, আর দেরী না করে ওরা হোটেলের পথে পা বাড়ালো।

র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হোটেল সংলগ্ন চেকমেট রেস্তোরাঁয় রাত সাড়ে আটটায়। সকলে এসে জমায়েত হলো একে একে। গেঈ এলো সকলের শেষে। পরনে তার কমলালেবু রঙের ছোট স্কার্ট–গায়ের সঙ্গে আঁট হয়ে বসে আছে। ফেনেল স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলো গেঈকে। জীবনে মেয়েমানুষ কম দেখেনি সে। কিন্তু এর মতো কেউ তার চোখে পড়েনি। গেঈ যেন এক জ্বলন্ত কামনা, লালসার এক উন্মত্ত রূপ।

গ্যারী বললো, বলুন, কি খাবার বলবো? সকলেই ক্ষুধার্ত। মাংস–পাঁউরুটি এবং অন্যান্য রুচিকর খাবারের ঢালাও অর্ডার দেওয়া হলো।

খেতে খেতে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, ব্যবস্থা যখন সব হয়েই গেছে তখন আগামী কালই রওনা দেওয়া ভালো। যত আগে বেরিয়ে পড়া যায় ততোই ভালো। জোন্স বলল, সাধারণতঃ এদিকের চেয়ে ড্রাকেন্সবার্গ-এ বৃষ্টি শুরু হয় দেরীতে।

সে বললো, কালেনবার্গের বাড়ি মেনভিল থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার। হেলিকপ্টার থাকবে মেনভিলে। আকাশপথে চারশো কিলোমিটার আর কতক্ষণ! মিঃ গ্যারী আর মিস্ গেই বরং একদিন থেকে যাবে মেনভিল-এর ক্যাম্পে। আমরা মিঃ ফেনেলকে নিয়ে গাড়িতে এগোবো। কাল সকালে রওনা দিলে ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা দুপুরের একটু পরেই মেনভিল-এ পৌঁছে যাবো। ওখানে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমি আর মিঃ ফেনেল বেরিয়ে পড়বো। আপনারা দুজন তার পরদিন বেলা দশটার পর হেলিকপ্টার ছাড়বেন। কালেনবার্গের জমিদারীর সীমানায়। পৌঁছতে আপনাদের সময় লাগবে বড়জোর ঘণ্টাখানেক।

গেই জানতে চাইলে মেনভিল জায়গাটা কিরকম?

ঘোড়ার গাড়ি আর টাঙ্গার রাজ্য বলতে পারেন। জোন্স থামলো, শহরে আমরা থাকবো না। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরের এক বনে তাবু খাঁটিয়ে আমাদের ক্যাম্প হবে।

ফেনেল মিস ডেসমন্ড-এর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলেই ফেললো আপনি এখন আর কি করবেন, চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি আশেপাশে।

গ্যারী চমকে তাকালে ফেনেলের দিকে। গেঈ উঠে দাঁড়ালো, রেস্তোরাঁ ছেড়ে যাবার আগে বলে গেল, তার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

ফেনেলের চোখে আগুন ঠিকরে পড়লো। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, আচ্ছা দেখে নেবো একদিন তোমাকে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো স্যালিকের সাবধান বাণী। গেঙ্গয়ের দিকে নজর দেবার কোনো চেষ্টা করবেন না। যদি শুনি কোনো রকম নষ্টামির চেষ্টা আপনি করেছেন–আপনার সব গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবো আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা দপ্তরে।

অস্বস্তিবোধ করলো ফেনেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলো, তারপর সেটা ধরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ভাবতে লাগলো স্যালিক কি করে জানলো তার গোপন ব্যাপার। সে আর ভাবতে পারছে না। ওপাশের বাড়িটার মাথায় নিয়ন সাইনে বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে–জ্বলছে নিভছে–একে একে স্বাভাবিক হয়ে এলো তার মন।

.

০৫.

ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা ম্যাক্স কালেনবার্গের বরাবরকার অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি সাতঘণ্টা ঘুমোন।

ঘুম ভাঙতেই জানলা দিয়ে চোখে পড়ে দূরে ছবির মতো পাহাড়ের সারির আড়ালে সূর্য উঁকি মারছে রক্তাক্ত চোখে।

বিরাট বিলাসবহুল তার বিছানাটি কমলা রঙের দামী সিল্কে মোড়া ডিম্বাকার এক কাঠের। পাটাতনের ওপর বসান। হাতের নাগালের মধ্যে ধোঁয়াটে এক কাঠের একটি বোর্ডে রঙবেরঙের একসারি বৈদ্যুতিক বোতাম। ঘুম ভাঙার পর একটি বোতাম টিপে তিনি নিয়মিত কয়েকটি কাজ করেন।

শায়িত অবস্থায় ম্যাক্স কালেনবার্গকে দেখায় রূপালী পর্দার নায়কের মতো। মাথা আগাগোড়া কামানো, নীল আয়ত দুটি চোখ, সুন্দর দীর্ঘ নাক, ভরাট মসৃণ মুখ, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রঙ তামাটে।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখলেন তিনি। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সবুজ বোতাম টিপে তাকালেন টেলিভিশনের দিকে। পর্দায় ভেসে উঠলো মায়ার মুখ। লাবণ্যে ঢলটল মুখখানি তাঁর ছবির মতো সুন্দর। ম্যাক্স সুন্দরের পূজারী। তিনি তার অফিসে সুন্দরী মেয়েদের বেছে বেছে চাকরি দেন।

খাতা পেন্সিল হাতে মায়া হাসলো তার দিকে চেয়ে সুপ্রভাত।

–তুমি ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। এক ঘণ্টা পর ডিক্টেশন দিতে ডাকবো আমি।

টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে কালো বোতামটি টিপে মানের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

শোবার ঘরে তিনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না কখনও। পোশাক পরা অবস্থায় হুইল চেয়ারে। বিশেষভাবে নির্মিত ঢাকনায় পা দুটি ঢেকে তবেতিনি নিশ্চিন্ত হন,কারণ পাদুটি নিয়ে তার মানসিক। দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

এই ঘরটি তার অফিসঘর। বিশাল স্বাচ্ছন্দ্যময়। দেওয়াল জোড়া জানালা, ডেস্কে বসে জানলা দিয়ে লনের সবটুকু ছাড়াও ফুলের কেয়ারী,দুরের জঙ্গল এবং জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে।

ডেস্কে চিঠিপত্র সাজানো, গুরুত্ব অনুসারে এক-একটাতে এক-এক রঙের ফ্ল্যাগ লাগানো।কাল ঘুমোতে যাবার আগে জরুরীকয়েকটি চিঠি তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন। সেগুলো হাতে তুলে । তিনি সবুজ বোতাম টিপলেন। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠলো মায়ার মুখ। তিনি ডিক্টেশন দিতে শুরু করলেন।

দ্রুত সেদিন ডাকে আসা চিঠিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশ খানার মতো চিঠি।

একটু পর দরজা খুলে কালেনবার্গের একান্ত সচিব গাইলো টক মার ঢুকলো। কালেনবার্গ আবিষ্কার করছিলেন, পরিদর্শিতা ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিরল গুণের অধিকারী টক। সে নির্মম, দয়ামায়াহীন এবং প্রভুর প্রতি একান্ত অনুগত। বেশ কিছুদিন ধরেই কালেনবার্গ তাঁর মিউজিয়াম সাজাবার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ শিল্পচোরের সাহায্য নিচ্ছিলেন। এদের ঠিকমতো পরিচালনা করা, এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এ এক মহা ঝাটের বিষয়। অনেক বিচার-বিবেচনা করে তিনি ঠিক করলেন–একমাত্র টকের ওপরই নির্ভর করা যায় এসব ব্যাপারে। তাঁর হাতেই সব ভার দিলেন। এখন সে যে শুধু মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক, তাইনয় কালেনবার্গের তাবৎকাজের পরামর্শদাতাও সে।

-বর্জিয়া আংটির ব্যাপারে কিছু খবর আছে?

আছে। তিনটে চোর কয়েক মিনিট আগে এসে পৌঁছেছে র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশনালে। ফেনেল : প্যারিস থেকে গতকালই সোজা হোটেলে পৌঁছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এক গ্যারেজের মালিক স্যাম জেফারসন ওদের দরকারী জিনিসপত্র জোগাড় করে রেখেছে। জিনিসপত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছি আপনার জন্য। ওরা বিমানবন্দরে পৌঁছানো মাত্র ওদের ছবি তুলিয়ে নিয়েছি। ডেস্কের ওপর একখানা বড় খাম রাখলো সে,দলের মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দরী।

সকলের সম্পর্কেই প্রয়োজনীয় তথ্য খামের মধ্যে রাখা আছে।

–ঠিক আছে ধন্যবাদ। পরে আবার ডাকবো আপনাকে। টক চলে যাবার পর কালেনবার্গ একবার গেঙ্গর ছবিটি তুলে নিলেন। কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণ করে রেখে দিলেন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি পড়ে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর লাঞ্চ সারতে গেলেন। লাঞ্চ সেরে আবার টককে অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন, টক ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন বার্জিয়া আংটি কিনতে আমার কত খরচ হয়েছিলো মিঃ টক?

টক বললো, ষাট হাজার ডলার। মর্সিয়েল আংটি কিনেছিলো আড়াই লক্ষ ডলারে। আমরা সস্তায় পেয়েছি বলতে হবে। মর্সিয়েল এখন স্যালিককে আবার পাঁচ লক্ষ ডলার দিচ্ছে আংটিটা উদ্ধারের জন্য। আংটিটা না পেলে তার বার্জিয়ার যাবতীয় সংগ্রহ একেবারে কানা হয়ে যাবে।

কালেনবার্গ চোখ তুলে তাকালেন টকের দিকে, নিক সে, দিয়ে দিলেই হয় তাকে আংটিটা। চারটে চোর আংটির মালিক হওয়ার চেয়ে তার হওয়া অনেক ভালো। আসুক না ওরা এখানে, দেখাই যাক। আমরা বরং ওদের উৎসাহিত করি দেখি জল কোথায় গড়ায়। কিভাবে কি করতে হবে, সব আপনাকে পরে জানাবো। ওদের ঢোকাটাই সহজ হবে-বেরোনোটা নয়। তবে মনে রাখতে হবে, আংটি নিয়ে আমার জমিদারীর সীমানা ছেড়ে ওদের চলে যেতে হবে–তবেই আংটি ওদের। মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু বেরোতে দিতে আমার মন চায় না। ভেবে দেখুন ভ্যাটিকান থেকে জুপিটারের মূর্তি হারিয়ে রোমের কোন লোকই সুখী নয়।

টক বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়লো। কালেমবার্গ আরও বললেন যে, গোয়েন্দাবাহিনীকে আমার মাটির নীচের মিউজিয়ামের খবর জানানো কোনরকমেই ঠিক নয়।

কিন্তু তাই বলে স্যার, আপনি মর্সিয়েলকে আংটিটা ফেরৎ দেবেন।

-হ্যাঁ, আংটিটাই ফেরৎ যাবে তার কাছে উদ্ধারকারীরা নয়। অনেক দিন পর জুলুরা মানুষ শিকার করতে পেরে খুশী হবে। টক চমকে তাকালো তার দিকে।

টক বললো, জুলুদের আভাস দিয়ে রাখা ভালো।

আপনি বরং একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন। ভালো শিকার যে করবে সে-ই পুরস্কারটা পাবে।

টক উঠে দাঁড়ালো, আর কিছু বলবেন স্যার?

না, আর কিছু বলার নেই। হ্যাঁ ভালো কথা, আংটিটা আমাকে একবার পাঠিয়ে দিন তো।

টক চলে গেলে কালেনবার্গ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতাম টিপলেন, কিমোসা কোথায়? আসতে বলল ওকে।

কয়েক মিনিট পর সাদা পোশাক পরা একনজদেহবৃদ্ধবানটু এসে ঘরে ঢুকলো। কালেনবার্গের বাবার আমলের লোক। এখন জমিদারীর জুলু এবং অন্যান্য নেটিভ কর্মীদের সর্দার। শক্ত হাতে তাদের শাসন করে। কালেনবার্গের সামনে দাঁড়িয়ে সে আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো।

সেই বুড়ো ওটা কি এখনও আমাদের জমিদারীতেই বাস করে? কালেনবার্গ জানতে চাইলেন।

-হ্যাঁ মালিক

অনেকদিন দেখিনি ওকে। ভেবেছিলাম, এতদিনে ও বোধহয় আর বেঁচে নেই। কিমোসা চুপ করে রইলো।

বাবা বলতেন, লোকটা নাকি হাজার রকমের বিষটিষ জানে।

কালেনবার্গ বললেন, ওর কাছে গিয়ে বলল, আমার একটা বিষের ভীষণ দরকার। খুব ধীরে ধীরে সেই বিষে কাজ হবে। যার রক্তে একবার মিশবে সে বিষ, বারো ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা যাবে।

কাল সকালের মধ্যেই আমার বিষ চাই, কিমোসা মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলো।

কালেনবার্গ একটা দলিল বের করে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর টক একটি ছোট কাঁচের বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাক্সের নীল ভেলভেটের ওপর সিজার বার্জিয়ার আংটিটি বসানো। টক বাক্সটি ডেস্কের ওপর রেখে চলে গেলো।

দলিল পড়া শেষ করে কালেনবার্গ বাক্সটি তুলে নিলেন। দুআঙুলের চাপে ডালা খুলে আংটিটি বের করে হাতের তালুতে রাখলেন। তারপর আংটিটি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। অবশেষে একখণ্ড হীরার আড়ালে ঢাকা সেই স্থানটি চোখে পড়লো তার– এখানেই রাখা হয় সেই মারাত্মক তরল-বিষ।

.

সকাল আটটায় র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশানাল হোটেল ছেড়ে তারা রওনা দিলো ১৬ নং হাইওয়ে ধরে হ্যারি স্মিথের দিকে।

অভিযাত্রীর পোশাক সকলের পরনেবুশশার্ট, হাফ প্যান্ট, হাঁটু অবধি মোজা, মজবুত রবার শোলের জুতো এবং বাঘের চামড়া জড়ানো টুপি। গেঈকে খুব সুন্দর মানিয়েছে।

সামনের আসনে বসেছে গেঈ আর জোন্স। গাড়ির চালক জোন্স। গ্যারী আর ফেনেল পেছনের আসনে। জিনিসপত্র আর চারজন আরোহী মিলিয়ে গাড়িতে প্রায় ঠাসাঠাসি অবস্থা।

রওনা দেবার সময় আকাশে অল্প মেঘ ছিল। আবহাওয়া ছিল আর্দ্র। গাড়ি চওড়া রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো হু হু করে।

প্রথম কথা বললো জোন্স। হ্যারিস্মিথ এখান থেকে দুশো কিলোমিটার। হ্যারিস্মিথে পৌঁছে বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা ধরবো বার্জভিলের পথ। তারপর মেনভিলে পৌঁছে লাঞ্চ সেরে গাইডকে নিয়ে এগোবো আরও তিরিশ কিলোমিটার জঙ্গলের পথ ধরে। তবেই ক্যাম্পে পৌঁছবো। জঙ্গলের পথটাই হলো সবথেকে রোমাঞ্চকর।

জোহান্সবার্গ ছেড়ে এসে গেঈর ভালোই লাগছিলো।

গাড়ি এগিয়ে চললো। তিন জনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ফেনেল চুপচাপ দুপায়ের ফাঁকে তাঁর যন্ত্রপাতির ভারী ব্যাগটা চেপে ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে গেঈর নিটোল কাঁধের দিকে। মাঝে মাঝে পথের পাশে মৌমাছির চাকের মতো কয়েকটা কুটীর।

বেলা দুটোর সময় গাড়ি এসে পৌঁছালো মেনভিলে। শহরটা পরিষ্কার নয়। মাঝখানে একটা ছোট পার্ক। অশোক ফুলের গাছএখানে ওখানেকয়েকটা ছড়িয়ে আছে। পার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে জোন্স ভাঙাচোরা গ্যারেজে গাড়ি এনে তুললো। গাড়ি থেকে

নামতেইদুজন বানটু এগিয়ে এলো তার দিকে। করমর্দন করলো, দেশী ভাষায় পরস্পর কুশল বিনিময় হলো।

সঙ্গীদের দিকে ফিরে জোন্স বললো, গাড়িটা বরং এখানেই থাক, হোটেল থেকে কিছু খেয়ে আসা যাক।

রোদের তাপ বেড়েছে। জোহান্সবার্গ ছাড়ার কিছু পরেই সূর্য উঠেছে–এখন প্রচণ্ড তেজ। সবাই মিলে রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলো।

হোটেলটি সাধারণ হলেও বেশ পরিষ্কার। জোন্স এক ঘর্মাক্ত কলেবর রেডইন্ডিয়ান ওয়েটারকে ইশারায় ডাকলো, থেম্বার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

হয়েছে, গেছেহয়তো আশেপাশে কোথাও,এখুনি আসবে। জোন্স উঠে দাঁড়ালো থেম্বার খোঁজ করার জন্য। গেঈ জানতে পারলো যে থেম্বাই হলো আমাদের গাইড।

দূরে এক শক্তসমর্থ চেহারার বানটুকে দেখা গেলো। বুকের ওপর কাপড় গিট দিয়ে বাঁধা, ছড়ানো পালকের টুপি আলগোছে মাথায় কাত করে বসানো।

জোন্স পরিচয় করিয়ে দিল। গ্যারী এবং গেঈকরমর্দনকরলো তাঁর সঙ্গে।সকলে মিলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো, থেম্বা গিয়ে বসলো পেছনের সীটে মালপত্রের ওপর।

মিনিট দশেক পর গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের এক মেঠো পথ ধরলো। রাস্তা উঁচু নীচু, এবড়ো-খেবড়ো–প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চললল ল্যান্ডরোভার। রাস্তা এতই

খারাপ যে গাড়ির গতিবেগ কমাতে হলো। এখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত গাড়ি লাফাতে লাগলো খুব। আরো মাইল খানেক এগিয়ে থেম্বার নির্দেশে জোন্স গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালো। জঙ্গল এবারে একটু ঘন। এখানে সেখানে কাটার-ঝোঁপ, ডালপালা নীচু করে পথ ঢেকে রেখেছে।

এখানে-সেখানে কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে। মরে গেছে কয়েকটা। গেঈ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো জোন্স-এর। –এগুলো এই রকমের কেন? বাজ পড়েছে নাকি?

না না, জোন্স গিয়ার বদলালো, এসব হলো হাতির একপাল এদিকে এসেছিলো, ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে সব। জিনিসপত্র ক্ষতি করতে হাতির মতো ওস্তাদ আর কেউ নয়। আর একটু এগিয়ে দেখা গেলো পাঁচটা জিরাফ। শূন্যে মাথা তুলে চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে।

থেম্বা ওপরে বসে জোন্সকে নির্দেশ দিচ্ছিলো। জোন্স গেঈ-এর দিকে তাকিয়ে বললো, থেম্বা ছাড়া এই জঙ্গলে আমি অসহায়, একেবারেই অসহায়। এদিকের পথঘাট সব ওর নখদর্পণে।

আরো আধঘণ্টা কাটলো। একপাল জেব্রা একবার হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ওপাশের জঙ্গল থেকে, রাস্তা পার হয়ে ঢুকলো, এপাশের জঙ্গলে। গাড়ি এসে এক ভোলা জায়গায় থামলো। হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে একটা। চারজন বানটু আছে হেলিকপ্টার ঘিরে। গাড়ি থামাতে তারা উঠে দাঁড়িয়ে জোন্স-এর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

গাড়ি থেকে নেমে জোন্স তার সঙ্গীদের দিকে তাকালো।

গ্যারী গেলো হেলিকপ্টার দেখতে। বানটুদের বিদায় করে জোন্স ফিরে এলো। গেঈকে বললো ওই দিকে গাছের আড়ালে একটা ঝর্না আছে, পুকুরও আছে একটা ছোট খাটো। গিয়ে স্নান করে আসতে পারেন।

ফেনেল গুটি গুটি গেঈ-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

গেঈ লম্বা ঘাসে ছাওয়া জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালো।

ফেনেলের হৃৎপিন্ডের স্পন্দন বাড়লো। রক্তে শিহরণ খেলে গেলো। গ্যারী হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলায় ব্যস্ত। জোন্স,আর থেম্বা এদিকে তাবু খাটাচ্ছে। সে আর দাঁড়ালো না। বড় বড় পা ফেলে এগোলো জঙ্গলের দিকে।

গেঈ একটু আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার মাংসল নিতম্ব ঢেউয়ের মতো দুলছে হাঁটার ছন্দে। ফেনেল আরো জোরে পা চালালো।

আরো একটু এগিয়ে ঝর্না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নেমে নদীর আকারে ঢুকে পড়েছে বনের মধ্যে।

গেঈ ফেনেলের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো। রোদ এসে পড়েছে গেঈর চোখেমুখে। চারপাশে গাছপালা, ঘন-জঙ্গল। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

ফেনেল গেইকে বললো, চলো সাঁতার কাটি দুজনে। জামা খোলো,ন্যাংটা মেয়েমানুষ দেখা আমার অভ্যাস আছে।

গেঈ ঠাণ্ডা ভাবলেশহীন চোখে তাকালে ফেনেলের দিকে, আপনি স্নান করুন–আমি যাই।

সে পেছন ফিরে এগোবার উপক্রম করতেই ফেনেল এক পা এগিয়ে তার হাত চেপে ধরলো।

যাওয়া চলবে না তোমার, এখানে থাকতে হবে, জামা-প্যান্ট খুলে আমার সঙ্গে স্নান করতে হবে।

গেই শান্ত স্বরে বললো, হাত ছেড়ে দিন আমার।

গেই ফেনেলের কব্জি চেপে ধরলো। ফেনেল গেঈ-এর কোমর জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো। আচমকা এক লাথি এসে পড়লো তার বুকে।— ফেনেল শুন্যে উড়তে উড়তে এসে পড়লো পুকুরে। গেঈর হাতে একটা বড় পাথরের টুকরো চোখে ঘৃণার দৃষ্টি। গেঈ পাথরসমেত হাত তুলেশাসালো, খবরদার, উঠলেই মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার কাছে আর কোনদিন ঘেঁষতে আসিস না। জলের ওপর সে পাথরটা ছুঁড়ে দিলো, জল ছিটকে উঠলো ফেনেলের চোখে মুখে।

.

কালেনবার্গ একগাদা চিঠি সই করছিলেন তার কামরায়, এমন সময় কিমোসা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

কালেনবার্গ তার দিকে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ছোট একটি শিশি রাখলো। শিশিটি হলো বিষের শিশি। বারো ঘণ্টার মধ্যে কাজ হবে এমন বিষ। কালেনবার্গ খুশী হলেন। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তার মুখ। বললেন, বাঃ বেশ বেশ। এখন যাও, ওষুধের আলমারী থেকে আমাকে একটা সিরিঞ্জ আর একজোড়া দস্তানা এনে দাও।

কিমোসা একটু পরে দস্তানা আর সিরিঞ্জ নিয়ে ফিরে এলো। সে চলে যেতে তিনি ড্রয়ার খুলে কাঁচের বাটি বের করলেন।

বাক্স থেকে আংটিটি তুলে ডান হাতের অনামিকায় পড়লেন। ছোট ছোট অসংখ্য হীরের টুকরো থেকে ঠিকরে পড়লো দ্যুতি চারিদিকে। দুআঙুলে চেপে খুলে ফেললেন আংটির গোপন দরজা। আংটি রেখে শিশি খুলে সিরিঞ্জে টেনে তুললেন খানিকটা বিষ। তারপর সযত্নে আংটির ফাঁকা জায়গাটিতে ঢেলে দিলেন সবটুকু। জায়গাটি পূর্ণ হতে সিরিঞ্জ রেখে গোপন দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। ড্রয়ারে আংটি রেখে একটি বড় খামে তিনি রুমাল, সিরিঞ্জ, শিশি এবং দস্তানা জোড়া ঢোকালেন। কিমোসাকে আবার ডেকে বললেন, এই খামটা পুড়িয়ে ফেলো, সাবধান শিরিঞ্জের ছুঁচে যেন হাত না লাগে।

কিমোসা চলে গেলে কালেনবার্গ চঞ্চল হলেন। কল্পনার ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া তার অভ্যাসের বাইরে, সঠিক প্রমাণ চাই সবকিছুর তবেই শান্তি। ছুঁচের দিকটা ওপরে এনে ডান হাতের অনামিকায় পরলেন আংটিটা। হাতের তালুর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন হীরেগুলো। তারপর চেয়ার চালিয়ে কামরা ছেড়ে এলেন বাগানে। পেছনে এলো হিন্ডেনবার্গ।

জোয়াইদকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেলো। জোয়াইদ তার বানটু কর্মচারীদের একজন। বাগানে মালীর কাজ করে। গাছের ছায়ায় বসে জোয়াইদ ঝিমোচ্ছিলো। কালেনবার্গকে দেখে চকিতে উঠে বসে। কালেনবার্গ তার কাছে এসে চেয়ার থামালেন। হিন্ডেনবার্গ মাটিতে বসে পড়লো। শান্তস্বরে তিনি বললেন, শুনলাম তুমি নাকি এ মাসের শেষেই চলে যাচ্ছো?

জোয়াইদ ভয়ে মাথা নাড়লো। কালেনবার্গ ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। হ্যান্ডশেক করবে না? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জোয়াইদ ইতস্ততঃ করলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িয়ে দিল হাত। কালেনবার্গ তার ময়লা হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে করমর্দন করতে করতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জোয়াইদ একটু চমকে উঠলো তারপর তার হাতের একটা আঙুল নিয়ে চুষতে শুরু করলো।

পরীক্ষার প্রথম পর্যায় সার্থক–ছুঁচের মুখটা সত্যিসত্যিই এতদিনে তাহলে বন্ধ হয়ে যায় নি। আর বারো ঘণ্টা পরে বোঝা যাবে বিষটা সত্যিই মারাত্মক কি না।

.

খোলা জায়গায় ফিরে আসতেই গেঈ শুনলো হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন। সে একটু থমকে দাঁড়ালো। ইঞ্জিনের পাখা ঘুরছে বন্ বন্ করে। চালকের আসনে গ্যারী।

চিৎকার করে গেঈ বললো, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান আমি যাচ্ছি।

ইঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেলো তার স্বর। হেলিকপ্টার শূন্যে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জোন্স ও থেম্বাও দাঁড়িয়ে দেখছিলো হেলিকপ্টারের উড়ে যাওয়া। চোখের আড়ালে অদৃশ্য হতেই তারা শুরু করলো গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে। গেঈ এগিয়ে এলে তাদের দিকে।

জোন্স আকাশের দিকে তাকালো। বললো, যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততোই ভালো। বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা হবে। জোন্স গেঈ-এর দিকে তাকিয়ে বললো বন্ধুকে কোথায় রেখে এলেন?

সাঁতার কাটছে।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু ছিল, যার জন্য চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো জোন্স, তার দিকে, গণ্ডগোল কিছু করেছে নাকি?

–সে তো জানা কথা। তাচ্ছিল্যের সুরে বললো গেঈ, ঠাণ্ডা করে দিয়েছি একেবারে।

জোন্স সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তারপর থেম্বার হাত থেকে স্লিপিং ব্যাগ চারটে নিলো। তারপর গেঙ্গীকে বললো, আমার আর গ্যারীর মাঝখানে আপনি শোবেন। আমার পাশে শোবে থেম্বা তার পাশে ফেনেল।

এক রাতের তো ব্যাপার।

স্লিপিং ব্যাগগুলো তাবুতে রেখে জোন্স বেরিয়ে এলো। হাতে তাঁর ২২ বোরের রাইফেল আর একটা কার্তুজ। থেম্বা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে তাবুর একটু দূরে।

জোন্স বললো, দেখি কটা বনমোরগ পাই কিনা। যাবেন আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই চলুন।

দুজনে গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে।

ফেনেল গুটি গুটি বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে। গাড়ির থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সে গিয়ে ঢুকলো তাবুতে। হেলিকপ্টারের শব্দ আবার শোনা গেল। ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো উড়ো জাহাজটা। গ্যারী চালকের আসন থেকে নামলো। জোন্স এবং গেঙ্গী বন থেকে ফিরে এলো। জোন্স-এর কোমরের বেল্টে দড়ি দিয়ে বাঁধা চারটে বনমোরগ ঝোলানো।

গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে গেঙ্গী বললো, আমার জন্য দাঁড়ালেন না কেন?

ট্রায়াল দিচ্ছিলাম–সঙ্গে কাউকে নিতে ভরসা পাইনি।

থেম্বা মুরগীকটা নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলো। সবাই মিলে ঘাসের ওপর বসে পড়লো। এবারে কাজের কথায় আসা যাক্। জোন্স বললো, ফেনেল আমি আর থেম্বা ভোর চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে। সঙ্গে নেবো রাইফেল, বন্দুক আর স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক, খাবার। জোন্স গ্যারীর দিকে তাকালো তারপর গেঈ এর দিকে। আপনাদের দুজনকে এখানে একটা দিন বেশী কাটাতে হবে। পরশু সকালে কালেনবার্গের বাড়ির দিকে রওনা হবেন আপনারা।

তারপর সে কালেনবার্গের জমিদারী সম্বন্ধে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো।

এই হলো কালেনবার্গের জমিদারী। পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে জমিদারী পাহারা দেয় একদল জুলু।উত্তর দিকে পাহারা নেই, যাবার তেমন রাস্তাও নেই।কিন্তু থেম্বার মতে একটু কৌশল খাঁটিয়ে যেতে পারলে ঐ পথটাই সবচেয়ে নিরাপদ। গাড়ি নিয়ে যতটা এগোনো সম্ভব এগোবো। বাকি পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাবে।

গ্যারী উঠে গেল থেম্বার রান্না দেখতে। গেঈ এসে দাঁড়ালো গ্যারীর পাশে। রান্নার গন্ধ শুঁকে গেই বললো, আমার তো ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে।

গ্যারী বললো, আমাদের আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ চলুন হেলিকপ্টারটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। দুজনে মিলে হেলিকপ্টারের দিকে এগোলো।

ফেনেল সেদিকে তাকিয়ে একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিলো। তাঁর সঙ্গে কথা বলার আর প্রবৃত্তি হলো না জোন্স-এর। সে উঠে থেম্বার কাছে গেলো।

বৃষ্টি আসতে আর দেরী নেই। সে থেম্বার পাশে এসে বসল। আধঘণ্টা পরে রান্না শেষ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, বাতাস ভারী হয়ে এলো। সকলে মিলে তাবুর চারপাশে গোল হয়ে খেতে বসলো। জোন্স তার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায় ফেনেল ছাড়া আর সবাইকে খোশ-গল্পে মাতিয়ে রাখলো। ফেনেল নিঃশব্দে মাথা নীচু করে খেলো।

খাওয়ার শেষে প্রত্যেকেরই চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এলো। সবাই মিলে শোবার জন্য তাবুর মধ্যে ঢুকলো। ফেনেল শুধুমাত্র অনেকক্ষণ ধরে তাঁবুর বাইরে ছিল তারপর চারপাশের অন্ধকার জমাট নিস্তব্ধতায় হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে তাবুর মধ্যে ঢুকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে।

রাত দুটোর সময় তাবুর চালে টপটপ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙলো সকলের। হঠাৎ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে ভেসে এলো এক সিংহেরক্রুদ্ধ গর্জন।

.

০৬.

ফেনেলের ঘুম ভেঙে গেলো চোখে জোরালো একটা আলো এসে পড়ায়। চোখ মেলে দেখলো থেম্বা আলো হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

থেম্বা ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে যাচ্ছে এই ফাঁকে জোন্স স্নানটা সেরে আসতে গেলো। ফেনেলও গেলো তার পিছু পিছু।

পুকুরের স্নিগ্ধ-শীতল জল স্নান করে শরীর জুড়োলো যেন।তাবুতে ফিরে এসে তারা দেখলো গেঈ আর গ্যারী ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বসে থেম্বার ডিমভাজা দেখছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে হতে অন্ধকার অনেকটা কাটলো। রাঙা আকাশের ফাঁকে সূর্য উঁকি মারলো- এবার রওনা দিতে হয়।

জোন্স বললো গ্যারীকে,তবুটা আপনারা দুজন ভাজ করে গুটিয়ে রাখতে পারবেন তো?

খুব পিরবো। গুটিয়ে হেলিকপ্টারে তুলে নেবো।

জোন্স বললো, ঠিক এগারোটায় ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাবো। এগারোটার পর থেকে দুঘণ্টা অন্তর অন্তর খবর পাবেন নিয়মিত।

ফেনেল গাড়িতে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগ সমেত উঠে পেছনের আসনে বসলো। জোন্স গেই এর সঙ্গে করমর্দন করে বসলো গিয়ে চালকের আসনে।

গাড়ি ছাড়লো জোন্স। থেম্বা তার পাশে বসে দুজনকে বিদায় জানালেন।

.

জঙ্গলে এখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। হেডলাইট জ্বেলে ধীরে ধীরে এগোতে হলো। থেম্বার নির্দেশ অনুসারে গাড়ি চালাতে লাগলো জোন্স।

একটু পরে আকাশ পরিষ্কার হলো। আলো ছড়িয়ে পড়লো জঙ্গলে। থেম্বা হঠাৎইশারা করে জোন্সকে গাড়ি থামাতে বললো। গাড়ি থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরে একটা গণ্ডার দাঁড়িয়ে। গাড়ির শব্দে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকালো একবার। তার নাকের ওপর এক বিরাট খড়্গ। ফেনেল বললো, এগুলো বড় ভয়ঙ্কর হয়।

একে একে জোন্স গাড়ির গতিবেগ বাড়ালো। একপাল ইম্পালা পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির শব্দে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালালো।

হঠাৎ তারা দেখলে পথের পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো সিংহ শুয়ে রয়েছে। ফেনেল রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত হয়ে রইলো। গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সিংহ দুটো মাথা তুললো একবার তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে চোখ বুজলো। ফেনেলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

এবারে ওরা জঙ্গল পার হয়ে মাটির রাস্তায় পড়লো, থেম্বা ডানদিকে যেতে বললো, এই হলো কালেনবার্গ-এরজমিদারীতে পৌঁছবাররাস্তা,যাট কিলোমিটারলম্বা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে।এখন বাজে আটটা, জমিদারীর সীমানায় পৌঁছতে এগারোটা। ওখান থেকেই গ্যারীকে খবর পাঠাবো।

রাস্তা খুবই খারাপ। চড়াইয়ের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে ওরা ধীরে ধীরে। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি বেশ নরম, চাকা মাঝে মাঝে বসে যাচ্ছে মাটিতে।

জোন্স গিয়ার বদল করলো। পেছনের একটা চাকা হঠাৎ মাটিতে বসে গেলো। নিমেষে ব্রেক কষে গাড়ি থামালো জোন্স।

জোন্স গিয়ার পাল্টে ব্রেক আলগা করলো। গাড়ি ধীরে ধীরে গড়িয়ে নামতে লাগলো যে পথে এসেছিলো সে পথে। খানিকটা নেমে সেই চড়াই ছেড়ে আর একটা চড়াইয়ের সামনে থামালো সে গাড়ি। জল এড়াতে হলে এই চড়াই বরাবর উঠতে হবে–একটু ঘুর পথ। গাড়ি উঠতে লাগলো। পথে ঘোট ঘোট ঝোঁপঝাড়। দশ মিনিট এগিয়ে আবার থামতে হলো। পেছনের চাকা দুটো কাদায় বসে গেছে।

ফেনেল এবং থেম্বা গাড়ি থেকে নেমে দুজনে একসাথে গাড়ি ঠেলতে লাগলো। কাজ হলো, গাড়ি গর্ত ছেড়ে উঠলো।

সূর্য ততক্ষণে মাথার ওপর, নোদ বেশ চড়েছে। গাড়ি ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো।

পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণ হয়ে এলো। এখানে-সেখানে বড় বড় পাথর। দেখে মনে হয় না যে এ পথে কখনও গাড়ি এসেছে। গাছের ডাল বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে। থেম্বা বলেছে সামনের রাস্তা নাকি আরও খারাপ। এইভাবে গড়াতে গড়াতে এগোতে হবে আর কি। বলতে না বলতেই চাকা সরে গেলো। সজোরে ব্রেক কষলো জোন্স। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে, ডানদিকের চাকা গিয়ে পড়েছে একটা খানায়।

থেম্বা ছুটে এলো। টেনে তোলা ছাড়া উপায় নেই। তিনজনেই হাত লাগালো। শেষ পর্যন্ত। গাড়ি টেনে তোলা হলো। জোন্স চালকের আসনে ফিরে গিয়ে বসলো। গাড়ি

ছাড়ার আগে তিনজন মিলে একটু ড্রিঙ্কস করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাড়ি ছাড়লো। পথ ভীষণ খারাপ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি উঠছে। জোন্স অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে একটু অন্যমনস্কতার ফলে যে কোন মুহূর্তে কয়েক হাজার ফুট খাদে গড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ করে রোদ নিভে এলো। ধোয়ার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ভরে গেলো আকাশ এক নিমেষে। মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টি নামলো।

নিরুপায় হয়ে তিনজনে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে লাগলো গাড়ি থামিয়ে। শেষে একসময় মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্য উঁকি মারলো। জামাকাপড় ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগলো। সিগারেট ধরিয়ে জোন্স গাড়ি ছাড়লো। পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গাড়ি থামাতে হলো। পাহাড় ঢালু হয়ে দুভাগে নেমে গেছে নীচে। এক ভাগ সাধারণ উত্রাইয়ের মতো, আর এক ভাগ গভীর খাড়াই। দুটো অংশ মিশেছে গিয়ে অনেক নীচে উপত্যকায়। রাস্তা খুব খারাপ। কোনরকমে একটা গাড়ি চলতে পারে শুধু। দুপাশে গভীর অতলান্ত খাদ। একবার পড়লে আর রক্ষা নেই। ফেনেলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো।

গাড়ি থেকে ধরাধরি করে মালগুলোনামানো হলো। গাড়ি অনেকটা হাল্কা হলো, থেম্বা বললো এখনও আমাদের কুড়ি কিলোমিটার যেতে হবে। সামনের আর কিছুটা রাস্তা পার হতে পারলে তারপর রাস্তা ভালো। ঘড়িতে এখন ঠিক এগারোটা। জোন্স ট্রান্সমিটার তুলে নিলো হাতে। খবর আদানপ্রদান শুরু হলো।

জোন্স আগাগোড়া ঘটনাটা সংক্ষেপে গ্যারীকে জানালো।

শুনে গ্যারী বললো, মুশকিলে পড়েছে দেখছি। এক কাজ করো, কপিকলটা এবারে কাজে লাগাও। কোনো গাছে আটকে আস্তে আস্তে এগোবার চেষ্টা করে দেখো একবার।

–ঠিক বলেছো, ভালো মনে করিয়ে দিয়েছে। কপিকলের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। ট্রান্সমিটার বন্ধ করলো জোন্স। থেম্বা ত্রিপল সরিয়ে কপিকলের তারের এক প্রান্ত ধরে দৌড়ালো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। জোন্স তারের অপর প্রান্তের গোঁজটা দিলো ফেনেসের হাতে, ভালো করে বাঁধার জন্য। তারপর জোন্স গিয়ার পাল্টে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। হাত ব্রেক তুলে কপিকলের লিভার চালু করলো। ড্রামটা বনবন করে ঘুরতে লাগলো। জোন্স ড্রামের গতিবেগ কমিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলো স্টিয়ারিং ধরে–গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো।

ফেনেল গাড়ির পেছনে পেছনে চলেছে থেম্বা সামনের চাকা দুটোয় নজর রেখে হাত নেড়ে এগোতে বলছে জোন্সকে। গাড়ি গড়াতে গড়াতে এগোচ্ছে।গাড়ি কিছুটা যাবার পর হঠাৎ মাটি ধসে পড়লো। ফেনেল চীৎকার করে জোন্সকে থামতে বললো।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পেছনের চাকা তুলে রাখার চেষ্টা করলো, পারলো না। গাড়ি গড়িয়ে। পড়ছে খাদে। ফেনেল চীৎকার করে উঠলো। জোন্স ততক্ষণে সীটের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে, তারটা ভয়ানক ভাবে দুলছে। নীচে, অতলান্ত খাদ-অনন্ত মৃত্যু যেন অপেক্ষা করছে ওখানে।

তারের টানে ড্রামটা আস্তে আস্তে খুলে আসতে লাগলো। জোন্স লাফিয়ে উঠলো, বনেটের ওপর ড্রামের পাশের লোহার রডটা চেপে ধরলো এক হাতে, ঝুঁকে পড়ে আর এক হাতে ধরলো তারটা। গাড়ি গড়িয়ে পড়লো খাদে।

থেম্বা তারের এক প্রান্ত ধরে টেনে জোন্সকে তোলার চেষ্টা করছিলো। ফেনেল কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে গিয়ে যোগ দিলো তার সঙ্গে। দুজনের আকর্ষণে জোন্স প্রায় গড়াতে গড়াতে উঠে এলো। পা দুটো ছড়ে গেছে। রক্তে কাদায় শরীর একেবারে মাখামাখি।

একটু পরে সে মাটির ওপর উঠে বসলো। তার ক্লান্ত মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেলো। বলল, গাড়িটা গেলো। এখন আমাদের পায়ে হাঁটা ছাড়া আর উপায় নেই।

.

জঙ্গলের আড়ালে ল্যান্ডরোভার অদৃশ্য হতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো গেঈ। পুরুষটা দারুণ। আগুনের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলো সে।

গ্যারী তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। মেয়েটা নিঃসন্দেহে সুন্দরী। আগুনের ছটা এসে পড়েছে ওর মুখে। মুখখানি হয়ে উঠেছে আরো মোহময়। রক্তে কাপন লাগলো গ্যারীর। চোখ নামিয়ে তাঁবুর দিকে এগোলোদাড়িটা কামাতে হবে।

তাঁবুর ম্লান বাতির আলোয় দাড়িটা কামাতে কামাতে মনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছিলো গেঈর কথা। হেলিকপ্টারে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই শান্ত জনমানবহীন কনভূমিতে

তারাই কেবল দুজন। কি ভাবে যে সময় কাটবে গ্যারী বুঝতে পারলো না। গেঈ কি আত্মসমর্পণ করবে।

গ্যারী একটা ভোয়ালে নিয়ে বাইরে এলো, গেঈকে বললো সে স্নান করতে যাচ্ছে।

গেঈ কখানা কাঠ গুঁজে দিল অগ্নিকুণ্ডে। ধিকি ধিকি আগুনটা দপ করে জ্বলে উঠলো। হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হলো তার।

গ্যারীকে তার খারাপ লাগে না। সে সত্যি কাজের পুরুষ। গেঈর বুকে সে জোয়ার এনেছে।

সূর্যের তাপ খুব বেড়েছে। গ্যারীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। হাফপ্যান্ট আর জুতো পরে খালি গায়ে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছে সে। ভোয়ালেটা আলগোছে কাঁধের ওপর ফেলা। কি দুরন্ত পৌরুষ। দেখে মুগ্ধ হলো সে। মৃদু হেসে বললো, কি, কেমন লাগলো?

দারুণ! বরফ-ঠাণ্ডা জল, শরীর যেন জুড়িয়ে গেলো।

আমি একবার ঘুরে আসি তাহলে। উত্তরের অপেক্ষা না করে গেঈ দৌড়লো পুকুরের দিকে। গ্যারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

পুকুরে গিয়ে গেঈ জামা প্যান্ট খুলে ফেললো। এই নিরালা পরিবেশে নিরাবরণহয়ে স্নান করার তার প্রবল ইচ্ছা হল। পোশাক পুকুরের পাড়ে রেখে সে জলে ঝাঁপ দিলো।

কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে সে চিৎ হয়ে জলে ভেসে রইলো। আরামে শান্তিতে তার চোখ বুজে এলো।

হঠাৎ দুটো হনুমান পুকুর পাড় থেকে গেঙ্গী-এর জামা প্যান্ট তুলে নিয়ে অদৃশ্য হলো।

গেঙ্গী জল থেকে উঠে অবাক হলো। তার নজর গেলো পলায়মান হনুমান দুটির ওপর। এখন উপায়?

এদিকে গ্যারীতাবুর ছায়ায় বসে স্যালিকের দেওয়া ম্যাপটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলো।হঠাৎ সামনে তাকিয়ে তার হাত থেকে ম্যাপটা পড়ে গেলো। একি স্বপ্ন না সত্যি। গেঙ্গী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। গ্যারীর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়লো গেঙ্গীর নিরাবরণ দেহে। গেঙ্গী অসহায়ের মতো বললো বাঁদরের কাণ্ডকারখানা দেখ, জামা প্যান্ট সব তুলে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। তুমি এনে দাও না প্লিজ!

গ্যারী আর দেরী না করে ছুটলো পুকুর পাড়ে। গেঙ্গী ধীরে ধীরে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হলো তার। বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগলো।নীচু হয়ে রুকস্যাক থেকে মার এক প্রস্থ জামা প্যান্ট বের করলো সে। একমুহূর্ত কি ভাবলো তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সব মাটিতে।

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর পা মুড়ে দুহাতের তালুতে স্তনদুটি ঢেকে অপেক্ষা করতে লাগলো গ্যারীর জন্যে।

প্রায় এগারোটা বাজলো। গ্যারী পাশ ফিরলো। ওদের খবর পাঠাবার সময় হয়ে এলো।

গ্যারীকে ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না গেঈর, অনিচ্ছায় সে হাত সরিয়ে নিলো। গ্যারী উঠে জামা প্যান্ট পরলো। গেঈ আবার চোখ বন্ধ করলো।

গ্যারীর সম্বন্ধে গেঈর ধারণা এতটুকু অমিল হয়নি। গ্যারীর সঙ্গসুখ বেশ আরামের। গত এক বছর ধরে মনের ওপর বড় ধকল যাচ্ছিল তার। আজ সুখের প্রচণ্ডতায় সব ধুয়ে মুছে গেলো। কেমন একটা চরম পরিতৃপ্তি, কেমন একটা ঝিম ধরানো নেশা। এই নেশা ভাঙতে চায়নি গেঈ–জন্মজন্মান্তর গ্যারীর পাশে এমনিভাবে শুয়ে থাকার ইচ্ছা তার মন ভরিয়ে রেখে দিলো।

কিছুক্ষণ পর গ্যারীর ডাকে তাঁর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো। বিছানায় উঠে বসলো সে। গ্যারী চিন্তিত মুখে এসে তাঁবুতে ঢুকলো। গেঈকে বললো, ওরা তিনজন বড় বিপদে পড়েছে। রাস্তা ধসে গিয়ে গাড়ি খাদে পড়েছে। জোন্স প্রায় মরতে মরতে বেঁচেছে।

পৌঁছাতে পারবে তত শেষ পর্যন্ত?

বলছে তো পারবে। দুঘণ্টা পর আবার খবর পাঠাবে।

গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো গেঈ। গ্যারী বললো, ওদের কথা এখানে বসে বসে ভাবলে কোন সুরাহা হবেনা। তার চেয়ে চলো আমরা পুকুরে খানিকটা সাঁতার কেটে আসি তাতে মনটা খানিকটা ভালো হবে। দাঁড়াও ভোয়ালেটা নিয়ে আসি।

দুজনে হাত ধরাধরি করে এগোলো পুকুরের দিকে।

.

সূর্য মাথার ওপরে। দুর্গম পাহাড়ী পথ। কষ্ট একটু বেশী হচ্ছে, জোন্সও থেম্বার সঙ্গে ফেনেল আর পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। জোন্স বলেছে, কালেনবার্গের বাড়ি এখনো চব্বিশ কিলোমিটার।ওদের পা যেন আর চলতে চায় না। জোন্স-এর হাতে স্প্রিঙফিল্ড, কাঁধে রুকস্যাক। থেম্বার রুকস্যাক ভর্তি খাবারের টিন। পাঁচ লিটারের একটা জলের পাত্রও কাঁধে। কোথাও একটু বিশ্রামের জন্য গাছের চিহ্ন মাত্রও নেই।

পরের এক ঘণ্টা খাড়া চড়াই। পথের সবচেয়ে ক্লান্তিকর অংশ। জোন্স ঘড়ির দিকে তাকালো, আর দশ মিনিট পরে গ্যারীকে খবর পাঠাতে হবে। উত্রাইটুকু সহজেই ওরা পার হয়ে গেলো। জঙ্গলে গাছের ছায়ায় বসলো সকলে। রাস্তা এখন মোটামুটি ভালো। মনে হয় ছটার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

আধঘণ্টা বিশ্রাম করে ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর ওরা একটা গাছের ছায়া দেখে একসঙ্গে খেতে বসলো।

ফেনেল জানতে চাইলো এখনও আর কতটা পথ বাকী?

এখনো প্রায় ঘণ্টাতিনেকের পথ। তবেই বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে।

ঠিক তিনটে বাজতে গ্যারীর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা হলো। তারপর আবার শুরু হলো যাত্রা। দুপাশে বিরাট বিরাট গাছ–ছায়ার মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চললল। কিন্তু

তারা জানতে পারলো না সেই গহন অরণ্যে ওরা তিনজন ছাড়াও আরো লোক আছে যারা ওদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

কালেনবার্গ ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি করেন নি। কুড়িজন দৈত্যাকৃতি জুলুকে তিনি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন জঙ্গলে। গোপনে তারা সব লক্ষ্য করে খবর পাঠাচ্ছে কালেনবার্গের একান্ত সচিব মায়ার কাছে। মায়া দ্রুত শর্টহ্যান্ডে খবর লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছে হো-লুর কাছে। হো-লু টাইপ করে সেগুলো দিয়ে আসছে কালেনবার্গের ডেস্কে।

গাড়ি খাদে পড়ে যাবার পর যে তারা হাঁটতে হাঁটতে তার জমিদারীর সীমানায় ঢুকে পড়েছে-কালেনবার্গ সে খবর পেয়েছেন।

ওরা তিনজনে পৌঁছে গেছে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর বড়জোর ঘণ্টা দুয়েকের পথ।ওরা ঠিক করলো থেকে এখানে রেখে যাবে। ওদের কাজের সঙ্গে ওকে আর জড়াবেনা। কাজ হয়ে গেলে আবার ফেরার সময় সঙ্গে নেবে পথপ্রদর্শক হিসাবে।

ফেনেল অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো। জোন্স থেকে কি যেন বললো, থেম্বা হেসে ঘাড় নাড়লো।

জোন্স কাঁধে তুলে নিলো রুকস্যাকটা, রাইফেলটাও থাক। থেম্বার সঙ্গে করমর্দন করে বললো, পরশু রাত্রিতে আমরা ফিরবো। যদি একান্তই না ফিরি তবে পরের দিনটা দেখে তুমি চলে যেও।

ফেনেল এক পা এগিয়ে এসে কুণ্ঠিত চিত্তে হাত বাড়িয়ে দিলো। থেম্বা উষ্ণ করমর্দনে বিদায় জানালো তাকে। দুজনের চলা শুরু হলো। যতক্ষণ দেখা যায়, ওদের গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো থেম্বা।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আগুন জ্বালাবার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করতে হবে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে ডালপালা কুড়োতে লাগলো।

হঠাৎ যেন কিসের শব্দে সে থমকে দাঁড়ালো। ঝোঁপের আড়াল থেকে উঠে এলো এক জুলু। হাতে তার তীক্ষ্ণবর্শা, পরনে চিতাবাঘের ছাল। শেষ রৌদ্রের আলোয় ঝলসে উঠলো ইস্পাতের সুতীক্ষ্ণ ফলা। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছুঁড়ে মারলো তার অস্ত্র। থেম্বার অনাবৃত পিঠে গেঁথে বর্শাটা কাঁপতে লাগলো থরথর করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। কালো মাটির রঙ লাল হলো। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো থেম্বা। মাটির বুকেই মিশে গেলে তার শেষ নিঃশ্বাস।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

৭-৯. হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে

০৭.

হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে উঁকি মারলো গেই। দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসের মখমল বিছানো লন, ফুলের কেয়ারী, সোজা সোজা পথ এবং ছবির মতো একখানা বাড়ি। বাড়িটা লম্বা প্রায় সত্তর মিটার।

গেঈ বলে উঠলো কি সুন্দর বাড়িটা। একটা সুইমিং পুল, বিরাট মাঠ,বড় বড় ছাতা এবং বাগানে বসবার চেয়ার চোখে পড়লো। এবারে নেমে পড়া যাক।

হেলিকপ্টার নামাবার একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া গেলো অবশেষে। একটু নীচে নামতেই সামরিক পোশাক পরা তিনজন জুলু তাকালো মাথা তুলে।

গ্যারী এবং গেঈ লাফিয়ে নামলো আসন থেকে। একটা জীপ এসে থামলো একটু দূরে।

গ্যারীকে ফেলে গেঈ এগিয়ে এলো। টক গাড়ি থেকে নামলো।

–আমি গেঈ ডেসমন্ড। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড পত্রিকার তরফ থেকে এসেছি, হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

টক তাকে খুঁটিয়ে দেখলোবাঃ ছবির চেয়ে রক্তমাংসের মেয়েটা তো বেশীসুন্দরী। সংক্ষেপে সে করমর্দন সারলো।

–এরকম বিনা নোটিসে এখানে নেমে পড়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওয়ান-এর জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে এই সুন্দর ছবিরমতোবাড়িটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। নেমে পড়লাম। যদি অন্যায় করে থাকি বলুন, এক্ষুনি চলে যাবো।

গেঈ-এর কথা শুনে টক মৃদু স্বরে বললো, আপনার মতো সুন্দরী দর্শনার্থী এখানে কদাচিৎ আসেন। আপাততঃ এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, তারপর যাওয়ার কথা ভাববেন।

আমার নাম গাইলোটক।গ্যারীততক্ষণে এসে পড়েছে। গেঈ তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ টক, ইনি গ্যারী এডওয়ার্ডস–আমার পুষ্পক রথের রথী। টক মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো।

গ্যারী টক-এর সঙ্গে করমর্দন করলো।

গেই বলে চললো কি সুন্দর বাড়ি আপনাদের।

আমার বাড়ি নয় এটা মিস্ ডেসমন্ড। মিঃ ম্যাক্স কালেনবার্গ-এর মালিক।

গেঈ বড় বড় চোখ করে তাকালো তার দিকে, সেই বিখ্যাত ম্যাক্স কালেনবার্গ, কোটিপতি!

আমি তো শুনেছি লোকজন বড় একটা পছন্দ করেন না তিনি। গ্যারীর দিকে চিন্তিত ভাবে ফিরলো সে।

গ্যারী আমাদের থাকাটা বোধহয় ঠিক হবেনা, উনি বিরক্ত হতে পারেন। চলে যাওয়াই ভালো। বাঃ চোস্ত অভিনয় করছে তো গেঈ, গ্যারী ভাবলো।

টক বললো, আপনারা ব্যস্ত হবেন না মিস ডেসমন্ড। মিঃ কালেনবার্গ লোকজন ভালোবাসেন না, এমন নয়। তিনি আপনাদের দেখে খুশীই হবেন বরং। চলুন বাড়িতে যাওয়া যাক।

জীপে উঠলো তিনজন। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চললো বাড়ির দিকে। গাড়ি থেকে নেমে ফুলের বাগান এবং সুইমিং পুল বাঁয়ে রেখে তারা এসে ঢুকলো এক বিরাট ঘরে। এত প্রাচুর্য গেঈ বা গ্যারী জীবনে দেখেনি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তারা। নিঃশব্দে সাদা পোশাক পরিহিত একজন জুলু এসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে একটু গলা ভিজিয়ে নিন বরং। টক চলে গেলো।

জুলুটি অভিবাদন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। দুগ্লাস জিনের অর্ডার দিয়ে দুজন এলো ঘরের বাইরে প্রশস্ত–গাড়ি বারান্দায়। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মত্ত হলো। জুলু দুগ্লাস পানীয় এবং টোস্ট দিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় টক এলো।

মিস ডেসমন্ড, আপনাদের আগমনে মিঃ কালেনবার্গ খুবই খুশী হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখন দেখা করতে পারছেন না কারণ তিনি কয়েকটি জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন।

রাত্রিতে ছাড়া তিনি সময় করতে পারবেননা। আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে রাতটা এখানে কাটিয়ে যান।

গেঈ-এর চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো–বেশ রাতটা তাহলে কাটিয়েই যাই। কালেনবার্গকে আপনি দয়া করে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন মিঃ টক।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালোটক।টক গাড়ি বারান্দায় মায়াকে দেখেফিরলো।ইনিমিস-দাস। আপনাদের দুজনের দেখাশোনা ইনিই করবেন। আমার একটা কাজ আছে চলি।টক বিদায় নিল।

মায়া এগিয়ে এলো, আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।

মায়া একটা ট্রলীতে করে ওদের নিয়ে একেবারে একটি লম্বা বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছলো। বারান্দাটা এতো লম্বা যে খাটনি বাঁচাবার জন্য এই ভাবেই যাতায়াত করতে হয়।

মায়া ট্রলী থামিয়ে একটি দরজা খুলে বললো, এই আমাদের অতিথি নিবাস। আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘরটি বিলাসবহুল আসবাবে নিখুঁত ভাবে সাজানো। মায়া বললো, যা যা দরকার এখানে সবই পাবেন। বেলা একটায় আপনাদের খাবার দেওয়া হবে বাইরের ঘরে, এই হলো আপনার শোবার ঘর মিস ডেসমন্ড। একটু এগিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললো সে।

গেঙ্গী খোলা দরজাপথে তাকালা ঘরের ভেতরে। ফিকে নীল রঙের দেয়াল, বিরাট একখানা বড় খাট, একধারে আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, নানারকম প্রসাধনসামগ্রী একটা রূপোর বাক্সে, সব মিলিয়ে ঘরটি ভারী সুন্দর। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেঙ্গী সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। বিছানার উল্টো দিকের দেয়ালজোড়া এক বিরাট আয়না। ঘরের আবহাওয়া গরম করে শরীর শুকিয়ে নেবার শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেশিন আছে একটা। বৈদ্যুতিক উপায়ে ম্যাসেজেরও মেশিন রয়েছে একধারে।

এতো বিলাস-ব্যসনে কেউ যে থাকতে পারে–গেঙ্গী-এর ধারণা ছিল না। সে বিস্ময়ে হতবাক হলো।

মায়া বলে গেলো স্বচ্ছন্দে আপনারা যা খুশি করতে পারেন–বিশ্রাম করতে পারেন, বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারেন। যখনই কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে আমাদের ফোনে দয়া করে জানাবেন। মৃদু হেসে মায়া বিদায় নিলো।

গেঙ্গী এবং গ্যারী উভয়ের দিকে তাকালো, গ্যারী আনন্দে শিস দিয়ে উঠলো। হঠাৎ একজন জুলু ঘরে ঢুকলো তাদের রুকস্যাক দুটি নিয়ে। মেঝেয় নামিয়ে রেখে নিষ্ক্রান্ত হলো। গ্যারী তাড়াতাড়ি খুলে দেখে নিলো ট্রান্সমিটার আছে কিনা। গেঙ্গীর দিকে তাকালো সে, দেখতে পায়নি তো ওরা ট্রান্সমিটারটা?

গেই বললো, দেখলো তো ভারী বয়ে গেলো। সে স্নান করার জন্য তৈরী হতে লাগলো। রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিলো।

পোশাক খুলে ফেললো শীঘ্র। বিরাট আয়নার সামনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের নিরাবরণ রূপ দেখতে লাগলো অনেক সময় ধরে। আয়নার পেছনে এক সঙ্কীর্ণ হুইল চেয়ারে বসে কালেনবার্গ তার প্রতিটি মনোহারী ভঙ্গিমাই হুবহু দেখতে লাগলেন। এক বিশেষ কায়দায় তৈরী আয়নাটি দ্বিমুখী। সামনের দিক থেকে সাধারণ আর পাঁচটা আয়নার মতোই। শুধু পারদের দিকটাই অন্যরকম–সেদিক থেকে আয়নার সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখার মতোই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

গেই ধীরে ধীরে এবার বাথরুমে গিয়ে বাথটবের কল খুলে দিলো।

.

জঙ্গলের আড়ালে বসে ফেনেল হেলিকপ্টারটা নামতে দেখলো। ঝড় বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া এক বিরাট পাথরের চাঁইয়ের ওপর তারা জায়গা বেছে বসেছে। গাছপালা, ঝোঁপঝাড়ে চারপাশে ঘেরা ডালপালার ফাঁক দিয়ে কালেনবার্গ-এর বাড়িটা পরিষ্কার নজরে আসছে। ফেনেলের চোখে শক্তিশালী দূরবীন। জোন্স ট্রান্সমিটার তুলে নিলো হাতে। খুলে রেখে দিলো সেটা। কখন গ্যারী খবর পাঠাবে কে জানে। ফেনেল একটা সিগারেট ধরিয়ে গা হাত-পা ছড়িয়ে দিলো পাথরের ওপর। ধকল বড় কম যায়নি–অমন একটা বোঝা ঘাড়ে করে এতখানি পথ হাঁটা। চোখ দুটো তার ভারী হয়ে এলো।

হঠাৎ ট্রান্সমিটারে খট করে একটা শব্দ হলো–ওপাশ থেকে খবর আসছে যন্ত্রটা কানের কাছে তুললো সে। জোন্স–গ্যারী কথা বলছি–বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি সব-পরে বলবো

আরো কথা–ছাড়ছি। মেশিন বন্ধ হতে ফেনেল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো জোন্স-এর দিকে।

ওরা আজ রাত্তিরটা বাড়িতেই কাটাচ্ছে। কালেনবার্গ অসন্তুষ্ট হয়নি বলে ওদের ধারণা। কালেনবার্গ রাতনটায় ওদের সঙ্গে দেখা করবেন। গ্যারী আমাদের এখানেই থাকতে বললো রাত এগারোটায় সে আবার খবর পাঠাবে।

এখন বেলা দুপুর। ওরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলো।

এদিকে গেঈ এবং গ্যারী দুপুরের খাওয়ার পর গাড়িবারান্দায় বসে আছে। গেঈকে খুব সুন্দর লাগছে, সোনালী রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। দুআঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

ওরা আলোচনা করতে লাগলো যে ফেনেল কি ভাবে ঢুকবে। গাড়ি বারান্দায় দুএকজন পাহারাদার থাকতে পারে।

চল, বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

বাইরে প্রচণ্ড গরমের জন্যে গে যেতে রাজী হলো না। গ্যারী তাকে বললো, তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি ঘুরে আসি। একথা বলে সে উঠে দাঁড়ালো। সবুজ সিমেন্টের পথ ধরে সে এগিয়ে গেলো। গেঈ তার গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। তারপর চোখবুজিয়ে গ্যারীর কথা ভাবতে লাগলো, চিন্তার সাগরে ডুবে আকাশ-

কুসুম ভাবনা ভাবতে লাগলো। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুম ভাঙলো গ্যারীর ধাক্কায়। সে এসে জানালো বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত যাবার এক্তিয়ার কারোর নেই।

বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মস্ত পুকুর। আর পুকুর ভর্তি কিলবিল করছে বড় বড় কুমির। গ্যারী জানালো যে এখানকার পরিবেশটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো। কাউকে বেপাত্তা করে দেবার পক্ষে জায়গাটা বেশ ভালো। আগাগোড়া ঘটনাগুলো ভাবলে কেমন যেন খটকা লাগে। কত সহজে ঢুকে পড়লাম আমরা। টক-এর দৃষ্টিটাও খুব সাংঘাতিক।

হঠাৎ ওরা টককে এদিকে আসতে দেখলল। টক এগিয়ে এলো তার মুখে একচিলতে হাসি। চোখের দৃষ্টি প্রথমে গ্যারীতারপর গেঈর ওপর গিয়ে স্থির হলো। কোন অসুবিধা হয়নি তো, দুপুরের খাওয়া?

গেঈ একমুখ হাসি নিয়ে জানালো যে, না, কোনো অসুবিধা হয়নি। জায়গাটা ভারী সুন্দর। টক হঠাৎ করে বলে উঠলো মিঃ কালেনবার্গের মিউজিয়াম দেখবেন নাকি মিস ডেসমন্ড?

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও এতটা চমকে উঠতো না গ্যারী। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘোরালো সে। গেঈ ভাবলেশহীন চোখে তাকালো টক-এর দিকে, মিঃ কালেনবার্গ-এর আবার মিউজিয়ামও আছে নাকি?

–আছে মানে? পৃথিবীর অন্যতম সংগ্রাহকদের মধ্যে মিঃ কালেনবার্গ একজন।

গেই বলে উঠলো, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা দেখতে চাই।

গ্যারীও মিউজিয়াম দেখার জন্য উৎসাহ দেখালো।

ঘর থেকে বারান্দায় এলো তারা। যেতে যেতে গেঈ এবং গ্যারীর মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিনজন গিয়ে ট্রলিতে উঠলো। ট্রলী লম্বা বারান্দা পার হয়ে এসে এক জায়গায় থামলো। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক দেয়াল। তারা ট্রলীথেকে নামলোটক কাছাকাছি একটা জানালার ওপর আঙুল দিয়ে কি যেন টিপলো। দেয়াল সরে গেলো এক পাশে। একটা বন্ধ দরজা চোখে পড়লো। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেলো। সমস্ত দরজাই বৈদ্যুতিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত।

তিনজনে এগিয়ে গিয়ে একটা লিফটে উঠলো। সাইডবোর্ডে চার রঙের চারটে বোতাম। টক প্রথমে সবুজ বোতামটি টিপলো। লিফট নীচে নামতে লাগলো ধীরে ধীরে। লিফট মাটি স্পর্শ করতে দরজা খুলে গেলো, তারা ঢুকলো শীতল গুহাকৃতি এক প্রকোষ্ঠে। কয়েক মিনিট টক গেই এবং গ্যারীকে দাঁড় করিয়ে রেখে দরজায় কি যেন সব নাড়াচাড়া করলো, তারপর তাদের দিকে ফিরে বললো, মিউজিয়ামে অমূল্য কতগুলি বস্তু আছে। চুরির ভয়ে আমরা সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছি। এই যে ঢোকার দরজাটা দেখছেন। এটা নিরেট স্টিলের তৈরী। চারপাশের দেওয়াল পাঁচ ফুট চওড়া। দরজায় আছে একটা টাইম লক–এই তালার এমনই কায়দা যে, রাত দশটায় বন্ধ করে দেবার পর, পরদিন সকাল দশটার আগে খোলার আর কোনো উপায় নেই। আসুন এবার।

নীচু ছাদের ঘর একখানি, মৃদু আলোয় রোমাঞ্চকর তার পরিবেশ। দেয়ালে–অসংখ্য ছবি। তাদের মধ্যে রেমব্রার একখানি, পিকাসোর কয়েকখানি এবং রেনেসাঁসের যুগের

কয়েকটি অনবদ্য শিল্পকর্ম গেঙ্গর চোখ এড়ালো না। তাঁর মনে হলো সে যেন একই সঙ্গে উফিজি, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম এবং লুভ-এ এসে হাজির হয়েছে।

এগুলো নিশ্চয়ই আসল নয়, তাই না মিঃ টক?

–কে বললো আসল নয়? আমি তো আগেই বলেছি আপনাদের মিঃ কালেনবার্গ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহকদের মধ্যে একজন। ভিতরের ঘরে চলুন, সেখানে আরো বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পাবেন।

ছবির ঘর থেকে বেরিয়ে তারা গিয়ে ঢুকলো এক প্রশস্তঘরে। ঘরের মাঝখানে চার মিটার উঁচু এক সোনার বুদ্ধমূর্তি।

টক বললো, ব্যাঙ্কক থেকে আনা হয়েছে মূর্তিটা। গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা মূর্তিটির খোঁজে শহর তোলপাড় করে ফেলেছে। মূর্তিটি আগাগোড়া নিরেট সোনার তৈরী। টক শিল্পকর্মের এক একটি নিদর্শন ব্যাখ্যা করলো তাদের কাছে। গ্যারীর শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ কম, তবু সব দেখেশুনে তার মন্দ লাগলো না। এগিয়ে চললো তারা।

গেঙ্গ ঘাড় ফেরালো, আর তখনই চোখে পড়লো তার বার্জিয়া আংটি, একটি ছোট আলোকিত মঞ্চের ওপর ছোট্ট একটি কাঁচের বাক্সে রয়েছে।

টক বললো, এই হলো সেই বিখ্যাত বার্জিয়া আংটি। বার্জিয়ার অনুরোধে এক স্বর্ণকার বানিয়েছিলো এই বিষের আংটিটা। শোনা যায় সেই স্বর্ণকারই হয়েছিলো বিষের প্রথম শিকার। আংটির কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে এবং স্বর্ণকারের মুখ চিরতরে বন্ধ করতে

সিজার আংটি আঙুলে পরে তার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। আংটির হীরেগুলোর আড়ালে লুকোনো আছে একটা সূক্ষাতিসূক্ষ্ম উঁচ-খোলা চোখে তা ধরা পড়ে না। বার্জিয়ার করমর্দনের সময় স্বর্ণকার মারা যায়।

গেই জানতে চাইলো যে এখনও আংটিটায় বিপদের আশংকা আছে কিনা।

না না মিস্ ডেসমন্ড। এখন আর সে ভয় নেই। আংটিটাকে আবার কার্যকরী করতে হলে আগে বিষ ভরতে হবে।

তারা এগিয়ে চললো। তাদের আরো আধঘণ্টা কাটলোনানারকম বিচিত্র নমুনা দেখে। তারপর সকলে মিলে বাইরে এলো। টক বিদায় নেবার আগে বলে গেলো যে দেড় ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি বারান্দায় নৈশভোজ দেওয়া হবে। একজন ভৃত্য এসে তাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

সাড়ে সাতটা বাজে তখন, ভোঙ্কার সঙ্গে মার্টিনি মিলিয়ে দুটি গেলাস নিয়ে বসলো দুজন। গ্যারী বললো জান গেই, আমার যেন কেমন লাগছে আগাগোড়া, বারবার মনে হচ্ছে আমরা যেন ফঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। ভেবে দেখ, মিউজিয়ামের প্রত্যেকটা জিনিসই যে চুরি করা–তা আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরতে পেরেছি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোআমরা একথা রটিয়ে দিতে পারি। তা সত্ত্বেও আমাদের মিউজিয়াম দেখানো হলো কেন? কেন টক আমাকে লিফট কি ভাবে কাজ করে এবং তালাটার গোলমেলে রহস্যের কথা শোনালো? এদের কি উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

গেঙ্গ মনে মনে ভাবলো, তাহলে কি আমরা এখান থেকে কোনদিন বের হতে পারবো না! চিরকাল এখানে আমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

গ্যারীর একটা ভরসা ফেনেল এবং জোন্স আছে। ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার একবার।

ঠিক কাটায় কাটায় নটা বাজে তখন একজন ভৃত্য এসে ডেকে নিয়ে গেলো তাদের গাড়ি বারান্দায়। কালেনবার্গ তাদের জন্য চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তারা আসাতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন।

ওরা আসন গ্রহণ করলে তিনি বললেন,টক এর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি অ্যানিম্যাল ওয়ার্লড পত্রিকার তরফ থেকে এসেছেন। কতদিন হলো আছেন ওদের সঙ্গে? আমি পত্রিকাখানি নিয়মিত রাখি। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে জানতে আমার ভালো লাগে, তা আপনার নামে তো কোনো লেখা, প্রকাশ হতে দেখিনি কোনদিন?

গেঙ্গ একটুও বিচলিত না হয়ে উত্তর দিল, আমি ওখানে মাস ছয়েক হলো আছি। কত বড় বড় লেখকদের লেখাই কাগজে বের হয় না আর আমি তো চুনোপুঁটি মাত্র। তাছাড়া আমার ওপর কতগুলি বাঁধা ধরা কাজ করার নির্দেশ আছে। ভাবছিলাম এই সুন্দর বাড়িটার একটা সুন্দর ছবি নিয়ে ছাপবো।

কালেনবার্গ তাকালেন মুখ তুলে। আমি দুঃখিত মিস্ ডেসমন্ড, এখানে ছবি তোলা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ।

–যাই হক এখানকার মিউজিয়াম আপনার কেমন লাগলো বলুন?

–অপূর্ব, এমন এক মিউজিয়ামের মালিক হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ কালেনবার্গ। তিনজন ভৃত্য এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো সুন্দর কারুকার্যখচিত এক ডিনার টেবিলের পাশে।

ডিনারে বসে কালেনবার্গ গ্যারীকে বললেন, মিঃ এডওয়ার্ডস আপনি কি একজন পেশাদার পাইলট?

গ্যারী মাথা নেড়ে বললো না, সবে আরম্ভ করেছি মাত্র। মিস্ ডেসমন্ডই আমার প্রথম খদ্দের।

কালেনবার্গ গেঈ এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তাহলে এক বিরাট কাজে নেমেছেন বলুন?

–হ্যাঁ বিরাট কাজই তোবটে। ওয়ানক-এর গভীর জঙ্গলে যাবোবলে বেরিয়েছি, চোখ পড়লো আপনার এই সুন্দর বাড়িটার ওপর। নেমে পড়লাম।

গেঈ বললো আপনার বাগানটা ঘুরে দেখলাম মিঃ কালেনবার্গ, দেখলাম যুদ্ধের পোশাক পরা একজন জুলু বাগান পাহারা দিচ্ছে। বেশ ভালোই লাগছে।

কালেনবার্গ বললেন, একশো জন এই ধরনের আমার পাহারাদার আছে। ওদের চোখ এড়িয়ে কেউ এখানে ঢুকতেও পারে না। আবার বের হতেও পারে না। সারা দিনরাত্তির ওরা পাহারা দেয় চারপাশের জঙ্গল।

গ্যারী কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, বাগান নিশ্চয় পাহারা দেবার দরকার হয় না?

না মিঃ এডওয়ার্ডস, রাতে বাগান পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকে না। যখন কোনো অতিথি আসেন এখানে, তখনই তারা বাগান পাহারা দেয়। তাও অবশ্য দিনে-রাতে নয়।

কালেনবার্গ চিন্তান্বিত ভাবে হিন্ডেনবার্গের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

আরো নানা ধরনের মুখোরাচক খাবার এলো। খাওয়া শেষ হলে টক এসে দাঁড়ালো- বিরক্ত করছি একটু স্যার, মিঃ ভোরস্টার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন কালেনবার্গ,ও ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

টক চলে গেল।

কালেনবার্গ বললেন, মাফ করবেন মিস্ ডেসমন্ড। আপনাদের সঙ্গ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, এখনও কয়েকটা কাজ বাকি পড়ে আছে। আপনারা চলে যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখা হবে। ছবি তোলার অনুমতি দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত, চলি।

গেঙ্গ এবং গ্যারী উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো। কালেনবার্গের সন্ধানী দৃষ্টি একবার ঘুরে গেলো দুজনের মুখের ওপর দিয়ে।

অফিসে পৌঁছে টক-এর সঙ্গে দেখা। টক খবর দিলো যে, গাইডটা মারা গেছে। ফেনেল আর জোন্স পাথরের ওপর বসে নজর রাখছে বাড়ির দিকে, এডওয়ার্ডস-এর সাথে ট্রান্সমিটারে যোগাযোগ করছে ওরা। কথাবার্তা যা যা হয়েছেসব টেপকরে রাখা হয়েছে। ফেনেল আজ রাত্রিরে এনএকলা আসবে। জোন্স ওখানেই থাকবে, এডওয়ার্ডসবুঝতে পেরেছেআমরা ওদের সন্দেহ করছি। টক বিদায় নিল।

কালেনবার্গ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তাকালেন তার দিকে। বিকেলের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো দেখতে লাগলেন কালেনবার্গ।

হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হলো, কিমোসা এসে ঘরে ঢুকলো।

–জোয়াইদ মারা গেছে।

কালেনবার্গ ভুরু তুলে তাকালেন তার দিকে, মারা গেছে–কি হয়েছিল?

–ঠিক জানিনা, মরার আগে শুধু বলছিল গলা নাকি জ্বলে যাচ্ছে।

বড় দুঃখের সংবাদ শোনালে কিমোসা, ঠিক আছে।কবর দেবার ব্যবস্থা করো। বেঁচে থাকতে ও তো কোন উপকারেই আসতো না, মরে গিয়েও তাই ক্ষতি হল না কারোর।

কিমোসা আড় চোখে তাকালো তার দিকে তারপর অভিবাদন করে বিদায় নিলো।

কালেনবার্গ চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে বসলেন। ঠোঁটের কোনে শয়তানীর হাসি খেলে গেলো তার, এই বর্জিয়া আংটি তাহলে এখনও তেমন মারাত্মক।

.

০৮.

গেঈ এবং গ্যারী তাদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে দেখলো বাইরের গাড়ি বারান্দার দিকের সমস্ত দরজা জানালা কে যেন এর মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে। শীততাপ যন্ত্রটি চালু থাকায় সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।

গ্যারী সমস্ত দরজা টেনে দেখলোখোলা গেলো না, সব তালা বন্ধ।

গ্যারী ভাবলো ফেনেলকে আগে সাবধান করে দেওয়া উচিত। তালা খোলার ব্যবস্থা সেই যা করে করবে। ঘড়ির দিকে তাকালো গ্যারী। এখন দশটা বাজে।

গ্যারী বললো আমার ধারণা লোকটা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। গেঈ শান্ত স্বরে বললো, মাথায়ও কিছু গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হয় আমরা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। এখানে একবার যখন এসেছি আর পিছু হটবার কোন মানে হয় না। শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হবে। বাগানে রাতে কেউ পাহারায় থাকে না–এটা মিথ্যা কথা। ফেনেলকে আমি বলে দেবো, আসার সময় সে যেন খুব সাবধানে আসে। গ্যারীও বললো–আমারও আগাগোড়া ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে।

গেঈ এবং গ্যারী দুজনে ঠিক করলো লিফটটা একবার দেখে আসবে। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে তারা দরজা খুলে বারান্দায় এলো। নিঃশব্দে তারা লিফটের দিকে গেলো, জানলার নীচের বোতামটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। টিপতেই দেয়াল সরে গেলো। লিফটের দরজা খুলে গেলো, গ্যারী ভেতরে ঢুকে প্রথমে লাল বোতামটা টিপে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিলো। তারপর সবুজ বোতাম টিপতে লিফট নীচে নামতে লাগলো। একেবারে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গ্যারী আবার সবুজ বোতাম টিপলো-লিফট উঠে এলো ধীরে ধীরে। ওপরে পৌঁছে সে লিফট থেকে বেরিয়ে এসে.জানলার বোম টিপে দেয়াল বন্ধ করে দিলো। তারপর গেঈর হাত ধরে নিঃশব্দে ছুটে এসে ঢুকলো ঘরে।

তাহলে বোঝা গেল যে লিফট চালু আছে। এখন ফেনেল এর ওপরেই সব–নিরাপদে এখানে ঢুকে মিউজিয়ামের দরজা একবার খুলতে পারলেই হলো।

একটু পরে গ্যারী ট্রান্সমিটারে কথা বললো ফেনেলের সঙ্গে। সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। ফেনেল বললো সে বাড়ির দুপ্রান্তের দুটি ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখতে পাচ্ছে।

ফেনেল জানালো আর আধঘণ্টার মধ্যে সে এখানে পৌঁছে যাবে। জোন্স এখানেই থাকবে আমাদের ইশারা না পাওয়া পর্যন্ত। গ্যারী ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিলো। গেইকে সে জানালো যে ফেনেল এখুনি রওনা দিচ্ছে। বাড়ির আর সব আলো নিভে গেছে। সে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে ঘরের বড় আলোগুলো সব নিভিয়ে দিলো। তারপর জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলোবাইরের অন্ধকারে।

আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা হেলিকপ্টারে মেনভিলে গিয়ে পৌঁছবো। গেঈ বললো এবার পোশাকটা পাল্টে আসি। শোবার ঘরে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে জামাপ্যান্ট পরে নিলো সে। গ্যারীও পোশাক পাল্টে নিলো।

আবার তারা গিয়ে জানালার কাছে বসলো।

একটু পরেই নিঃশব্দে ফেনেল জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। যন্ত্রপাতির ব্যাগ নামিয়ে সে ছোট টর্চের আলো ফেলে দরজার তালা পরীক্ষা করলো। তারপর প্রয়োজন মতো একটি যন্ত্র বেছে দরজার তালা খুলতে বসলো। কয়েক মিনিট পর খট করে একটা শব্দ, তালা খুলেছে। দরজা ঠেলে ফেনেল বসবার ঘরে এলো। গেঈর দিকে তাকিয়ে বললো, বেশ মজায় আছেন দেখছি।

গ্যারীর দিকে তাকিয়ে ফেনেল বললো চলুন, লিফটের দিকে যাওয়া যাক। গেঈকে তারা বলে গেলো, আমরা চললাম তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকো। গেঈ ঘাড় নেড়ে তাদের যেতে বললো।

গ্যারী দরজা খুলে ফেনেলকে ডাকলো, আসুন এদিকে, দেখে যান।

প্রায় পঁয়ত্রিশ খানা ঘর করিডোরের দুপাশে, নিঃশব্দে তারা এগোলো বারান্দা ধরে। কয়েক মিনিট পর লিফটে নামতে লাগলো নীচে। ফেনেল দরজার কাছে গিয়ে তালা এবং ডায়ালটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে পেছন ফিরলো। যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে কয়েকটা যন্ত্র বের করে সে মেঝেয় নামালো। গ্যারী চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টানতে লাগলো।

ফেনেল নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। কি যে করছে সে-ই জানে। গ্যারী অধৈর্য হয়ে পড়লো। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে লাগলো নিঃশব্দে। অবশেষে এক ঘণ্টা পর দীর্ঘ অপেক্ষার শেষ হলো। দরজা ঠেলতে খুলে গেলো। তার পর একের পর এক ঘরে ঢুকতে লাগলো। এগিয়ে গেলো সেই আলোকিত মঞ্চটির দিকে। কিন্তু একি! আংটি কোথায়? সেই কাঁচের বাক্সটির সঙ্গে আংটি-টিও উধাও হয়েছে মঞ্চ থেকে! তারা খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেলো দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে চারজন দৈত্যাকৃতি জুলু, পরনে তাদের চিতাবাঘের ছাল, হাতে বিরাট বর্শা। তাদের দুজনের চোখে স্থির দৃষ্টি। একজন ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বললো, আসুন আমাদের সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে। গ্যারী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফেনেল ইতস্ততঃ করলোপালাবার চেষ্টা বৃথা। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই পালাবার। অগত্যা সেনীচু হয়ে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগ কুড়িয়ে কাঁধে তুলে সেও গ্যারীর পেছন পেছন এগিয়ে গেলো।

দীর্ঘক্ষণ ধরে গেঈ একা একা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘণ্টা দুই ধরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। সে মনে করলে সে ওদের সঙ্গে গেলেই বোধ হয় ভালো হতো।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। গ্যারী শীঘ্র পরজা খুলে দিলো। কিন্তু একি–পাহারাদার জুলু একজন দাঁড়িয়ে দরজায়। বারান্দার মৃদু আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে তার হাতের বর্শা।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো গেঈ। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। জুলটি বলে উঠলো যে মালিক আপনাকে ডেকেছেন। ইতস্ততঃ করলো গেঈ, গ্যারী তাহলে ঠিকই

বলেছে–ওরা ফাঁদেই পা দিয়েছে। ভয়বোধটা ততোক্ষণে থিতিয়ে এসেছে। মনে সাহস সঞ্চয় করে ওদের সঙ্গে গিয়ে ঢুকলো কালেনবার্গের কামরায়।

এই তো এসে গেছেন আপনি! চোখ তুলে তাকালেন তিনি, আসুন, এদিকে আসুন। আমি একটা ভারী মজার জিনিস দেখাচ্ছি। টেলিভিশন-এর আলোকিত পর্দার দিকে তাকিয়ে গেঙ্গীয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো। পর্দায় ফেনেলকে মিউজিয়ামের দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আর দেখা গেলো যে ফেনেল তালাটা খুলে ফেললল। গ্যারী ফেনেলের দিকে এগিয়ে আসছে। গেঙ্গী নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো পর্দার দিকে। তার শরীরের সবটুকু রক্ত বুঝিবা জমে বরফ হয়ে গেছে।

কালেনবার্গ বললেন আজকে ইচ্ছা করেই লিফটটা চালু রেখেছিলাম। গেঙ্গী দেখলো ফেনেল মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলছে, কি হলো?

কালেনবার্গ টেলিভিশন বন্ধ করে দিলেন, বললেন, এই অবধি থাক, ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পড়বে। তখন বাকিটুকু জানা যাবে।

কালেনবার্গ একটি সিগারেট ধরিয়ে গেঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন স্যালিকের খবর।

গেঙ্গী একটুও চমকালো না। চমকের যা কিছু তা আগেই শেষ হয়ে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে সে বললো, এখানে আসার আগে তো দেখে এসেছিলাম বেশ ভালোই আছে, তবে এখন কি হয়েছে বলতে পারি না।

কালেনবার্গের চোখ জ্বলে উঠলো, এবার তাকে চিরদিনের মতো থামতে হবে। দপ করে জ্বলে উঠলো তার চোখ। –হীনতার সীমা তিনি ছাড়িয়ে গেছেন।

গেঙ্গ-এর স্বরে শ্লেষ ফুটে উঠলো, আমার তো মনে হয় তার মতো হীন জঘন্য চরিত্রের লোক আশেপাশে খুঁজলে আরো দু-চারটে অনায়াসে মিলবে। আপনিও তো কম যান নামিঃ কালেনবার্গ।

গেই কথা শেষ করতে না করতে দরজা খুলে গেলো। গ্যারী এবং ফেনেলকে নিয়ে চারজন জুলু ঘরে ঢুকলো।কালেনবার্গ হাতের ইশারায় জুলুদের চলে যেতে বললেন। তারা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কালেনবার্গ ওদের বসতে বলে ফেনেল-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিই মিউজিয়ামের দরজা খোলার জন্য। ফেনেল গর্জন করে উঠলো, আংটির জন্য এসেছিলাম আংটি পাইনি। এখান থেকে আমরা চলে যাবে। আপনি আমাদের অনর্থক আটকে রাখতে পারেন না।

নিশ্চয় যাবেন তবে যাবার আগে কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

-বার্জিয়া আংটির জন্য আপনারা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা একেবারে নষ্ট হতে দেব না আমি। মিস ডেসমন্ড একটু আগে বলেছিলেন, আংটিটা আইনত আমার প্রাপ্যও নয়, আপনারা আমার চেয়ে কম পরিশ্রম করেননি আংটিটা পেতে, তাই আমার একান্ত ইচ্ছা– আংটি আমি আপনাদের দিয়ে দেবো, তবে কয়েকটা শর্তে। ড্রয়ার খুলে কাঁচের বাক্সটি

বের করে তিনি ডেস্কের ওপর রাখলেন। গ্যারী এবং গেঈ আংটিটা দেখেই চিনতে পারলো।

গ্যারী বললো, কিসের শর্ত?

কালেনবার্গ বললেন, একটা খেলার আয়োজন করেছি আমি–শিকার খেলা। আপনারা তিনজন এবং আপনাদের এক বন্ধু জোল হবেন শিকার আর আমার জুলুরা হবে শিকারী। আপনাদের পালাবার সুযোগ আমি করে দেবো-ভোর চারটের সময় আপনারা রওনা দেবেন। তার তিনঘণ্টা পর সাতটায় জুলুরা রওনা দেবে আপনাদের খোঁজে। বেশ তাড়াতাড়ি এগোতে হবে কিন্তু আপনাদের, নয়তো ধরা পড়ে যাবেন। আর ধরা পড়লে আপনাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা · হবে।তিনি আরো বললেন যে, আমি জানি, আংটির জন্য আপনাদের পারিশ্রমিকনহাজার ডলার। আংটিটা নিয়ে যান–স্যালিককে দিয়ে দেবেন গি, কাঁচের বাক্সটি নিয়ে তিনি গেঈর হাতে তুলে দিলেন।

গ্যারী বলে উঠলো, তাহলে আপনি আপনার হীন বিকৃত-মনের সন্তুষ্টির জন্য এই শিকারের আয়োজন করেছেন–তাই তো?

কালেনবার্গের মুখের রেখা বদলে গেলো। শান্ত সদাশয় ভদ্রলোকটির মুখে ফুটে উঠলো ঘৃণা, চরম বিরক্তির চিহ্ন, আমার জমিদারীতে অনধিকার প্রবেশের শাক্তি আপনাদের পেতে হবেচরম শাস্তি। মিউজিয়ামে যখন ঢুকিয়েছি একবার, তখন আপনাদের মুখ চিরদিনের মতো বন্ধ না করে দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।

গ্যারী বললো তাহলে, কেন দিলেন আমাদের আংটিটা? ডাকুন আপনাদের লোকজন– মেরে ফেলুক আমাদের।

–না শিকার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আংটি দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু পালাতে দেব আর। তিনি ডেস্কের একটি বোতাম টিপলেন, একদিকের দেওয়াল সরে যেতে বিরাট একখানা ম্যাপ দেখা গেলো।–এই আমার জমিদারির ম্যাপ, বেশ ভালো করে দেখে নিন সকলে। আমার ইচ্ছা বেশ কয়েকদিন ধরে চলুক এ খেলা। দেখুন ম্যাপটা, পূর্ব দিক পাহাড়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকটাও সুবিধার নয় একটা নদী আছে, নদীর আশেপাশের জমিতে বড় বড় বিষাক্ত সাপ কুমির সবই আছে। উত্তর এবং পশ্চিম দিকের পথটাই সোজা, পশ্চিম দিকে মেনভিলের বড় রাস্তায় গিয়ে উঠতে আপনাদের মোট হাঁটতে হবে একশো কুড়ি কিলোমিটার,সুতরাংবুঝতেই পারছেন কত তাড়াতাড়ি যেতে হবে আপনাদের। জুলুদের হাঁটার গতি জানেন তো!

এসব ভেবেই তিনঘন্টা আগে আপনাদের রওনা দিতে বলেছি। এবারে যে পথ ইচ্ছা আপনারা বেছে নিতে পারেন রওনা দেবার জন্য।

কালেনবার্গ ঘড়ির দিকে তাকালেন, আমার ঘুমোতে দেরী হয়ে গেলো আজ, আপনারা ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিন একটু। ঠিক চারটেয় রওনা হবেন। বাধা দেবে না কেউ। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটবেন কিন্তু। মিস্ ডেসমন্ডদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা এখানকার লোকেদের মুখে মুখে ফেরে, শকুনের চোখে পলক পড়ে না। আমার জুলুদের চোখ কিন্তু শকুনের চেয়ে কম প্রখর নয়। গুডনাইট!

ওরা ঘরে ফিরে এলো। গেঙ্গী বললো, চলো আমরা এখন বাইরের দিকের দরজা খুলে পালাই। গ্যারী জানালে তার কোনো উপায় নেই, কেননা জুলুরা ওদিকে পাহারা দিচ্ছে।

ফেনেল কপালের ঘাম মুছে বললো, জোন্স-এর সঙ্গে আগে কথা বলে নিই। উত্তর দিকে রওনা দিয়ে থেকে সঙ্গে নিয়ে যেদিকে হয় যাওয়া যাবে, ওর কাছে রাইফেলটা আছে।

গেঙ্গী বাক্সের মধ্যে আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, গ্যারী বললো, এক কাজ করো আংটিটা তুমি আঙুলে পরে নাও। বাক্সের থেকে আঙুলে আংটিটা অনেক নিরাপদ হবে। গেঙ্গী আংটিটা আঙুলে পরে ফেললো।

চারটের সামান্য আগে ঘুম ভেঙে গেলো গেঙ্গীর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর, কোথায় যেন মাদল বাজছে–খুব দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও, রাতের সেই অন্ধকার যেন আরো ভারী, আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে মাদলের একটানা শব্দে

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে রুকস্যাকটা নিয়ে গেঙ্গীবসবার ঘরে এলোগ্যারীআর ফেনেল বাইরের দিকের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠিক চারটে বাজতেই এক বিশাল চেহারার জুলু এসে দাঁড়ালো বারান্দার দিকের দরজার বাইরে।

গ্যারী বললো, এক্ষুনি বেরোচ্ছি আমরা। দরজা খুলে দিলো সে।

মাদলের শব্দ আরো প্রবল হলো। দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় তিরিশ জন জুলু, পরনেতাদের চিতাবাঘের ছাল, মাথায় উটপাখীর পালকের টুপি। এক হাতে চামড়ার ঢাল, আর একহাতে নিরেট ইস্পাতের তৈরী তীক্ষ্ণ-বর্শা, আগুন জ্বলছে বৃত্তের মাঝখানে,

একজন জুলু আগুনের সামনে বসে উন্মাদের মতো বাজাচ্ছে এক প্রকাণ্ড মাদল। বাজনার তালে তালে নাচছে সেই তিরিশজন জুলু।

সেই বিশালাকৃতি জুলু তার বর্শা তুলে ধরলো তিনজনের দিকে প্রথমে, তারপরে জঙ্গলবরাবর তুললো।

গ্যারী এবং ফেনেল রুকস্যাক কাঁধে তুলে গেঈকে মাঝখানে রেখে এগোলো গুটি গুটি, মাদলের শব্দ আরো প্রবল হলো, ভয়ে গেইর গলা শুকিয়ে গেল।

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালালো, লন পেরিয়ে এগিয়ে চললল জঙ্গলের দিকে, পেছন ফিরে তাকাবার সাহস কারুর হলোনা,জঙ্গলে এসে প্রথম কথা বললো গ্যারী, ওঃ কি সাংঘাতিক। জোন্স কোথায়?

–ঐ তো ওখানে পাথরের চাইটার ওপর। ফেনেল দুহাত মুখের কাছে নিয়ে ডাকলো, জোন্স! তাড়াতাড়ি এসো–এদিকে।

টর্চ বের করে আলো জ্বেলে দোলাতে লাগলো সে। জোন্স-এর গলা শোনা গেলো, আলোটা জ্বেলে রাখো, আমি যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জোন্স এলো, পেয়েছে আংটিটা? হেলিকপ্টারে এলে না কেন?

পেয়েছি আংটি। ফেনেল বললো, থেম্বার কাছে যেতে হবে। হেলিকপ্টার নেই। চলে যেতে যেতে সব বলছি। ফেনেল আর জোন্স পাশাপাশি কথা বলতে বলতে এগোলো। গ্যারী আর গেই পেছন পেছন, সব কিছু শুনে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল জোন্স।

ওরা ভাবতে লাগলো-কি ভাবে কোন পথেজুলুদের এড়ানো যাবে, পূব দিকের পথ অসম্ভব। তারা কেউ পাহাড়ে চড়তে পারে না, উত্তর দিক সম্পর্কে কালেনবার্গ মিথ্যা বলেছে মনে হয় না-নিশ্চয় তার লোক আছে ও পথে, না হলে গ্যারীদের সম্পর্কে অত খুটিনাটি খবর পেলো কি ভাবে। বাকি রইলো শুধুদক্ষিণ দিকের পথ-কুমির আর বিষাক্ত সাপে বোঝাই। অবশ্য পশ্চিম দিকের পথটা ভালো।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তারা পৌঁছালো থেম্বার কাছে। আঙুল দিয়ে জোন্স দেখালো, ঐ যে, ঐ গাছের নীচে থেম্বার থাকার কথা।

ফেনেল আবছা অন্ধকারে চারিদিক তাকালো।

জোন্স চিৎকার করে ডাকলো, থে-মবা—

ডানার শব্দ করে উড়ে গেলো এক ঝাক নিশাচর পাখী কোথায়

না হাসলো। কিন্তু থেম্বার গলা শোনা গেল না।

জোন্স এগিয়ে গেল গাছের কাছে। না, ভুল হয়নি তার। এই তো একরাশ শুকনো কাঠ জমা করে রাখা, এইখানে ছিলো জলের টিন, রাইফেল আর খাবারের টিনের ব্যাগটা গেল কোথায় সব।

ফেনেল গর্জন করে উঠলো ঠিক ভেগে পড়েছে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে।

না না, তা কখনও হতে পারে না, নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে।

এটা কি! একটা জায়গা দেখিয়ে গ্যারী বলে উঠলো, সকলে তাকালো। সদ্য তোলা মাটির স্তূপ একটা, এগিয়ে গেল তারা সেদিকে। ক্রুপের ওপর থেম্বার ছড়ানো পালকের টুপিটা বসানো।

বুঝতে বাকি রইল না কার কবর ওটা! জোন্সই প্রথম কথা বললো, ওরা মেরে ফেলেছে ওকে–খাবার, জল, রাইফেল সব নিয়ে ওকে কবর দিয়ে রেখে গেছে! অনেকক্ষণ তারা নিঃশব্দে কবরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গ্যারী–দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, আমাদের আর দেরী করা উচিত হবে না জোন্স। চারটে রাস্তার মধ্যে আমার দক্ষিণ দিকের রাস্তাটাই ধরার ইচ্ছা। ওরা ভাববে আমরা হয়তো পশ্চিম দিক দিয়ে যাবে–তাই ঐ পথেই যাবে ওরা, ভাগ্য ভালো থাকলে মনে হয় কোনক্রমে হয়তো পার হয়ে যেতে পারবো সীমানা, তোমরা কি বলে?

রাস্তার ওপর নির্ভর করে সব। কুমিরের রাজত্ব বলে তো জানি ও দিকটা!

তবু ঐ পথই ভালো। তোমার কাছে কম্পাস আছে তো?

পকেট থেকে কম্পাস বের করে জোন্স দিলো গ্যারীর হাতে। গ্যারী কম্পাসের দিক ঠিক করে নিলো।

যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে গ্যারী, তার পেছনে গেঙ্গ তার পেছনে ফেনেল আর জোন্স। কেউ কোনো কথা বললোনা। থেম্বার মৃত্যুতে সকলেই শোকাভিভূত। আশু বিপদের আশঙ্কায় পরস্পর পরস্পরের অনেকটা কাছে এগিয়ে আসতে পেরেছে।

তারা দ্রুত এগোতেলাগলো, সময় চারটে বেজে পঞ্চাশ। আর প্রায় দুঘণ্টা পরেই জুলুরা রওনা দেবে।

আরো মিনিট কুড়ি চলার পর গ্যারী কম্পাসে দিক ঠিক করলো। এ পথটা পশ্চিম দিকে বেঁকে গেছে ক্রমশ, আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগোবো।

ঘন–গাছপালায় ঢাকা জঙ্গল। ইতস্ততঃ কাটাঝোঁপ, ঘাসগুলো, প্রায় মানুষের সমান উঁচু।

ফেনেল বললো, এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবো কি ভাবে?

–কিছু করার নেই। দক্ষিণ দিকের একটাই পথ।

জোন্স বললো, এই জায়গাটা খুব সাপের উপদ্রব। সাবধানে দেখেশুনে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

গেই গ্যারীর হাত চেপে ধরলো। গ্যারী সান্ত্বনা দিলো তাকে, ভয় নেই, আমি তো আছি।

উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। মাথার ওপর বাঁদর সমানে কিচির-মিচির করছে। তারা এগোতে লাগলো। গ্যারীকম্পাস নিয়ে বারবার দিক ঠিক করতে করতে এগোলো, কালেনবার্গ যখন ম্যাপটা দেখাচ্ছিলেন, সে দেখেছে, নদীটা দক্ষিণে জমিদারীর সীমানা পেরিয়ে একটা ছোট শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে জল আছে খুব সামান্য। নদীর কাছে গেলে সুবিধাই হবে সব দিক থেকে।

আরো তিন কিলোমিটার এগিয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে ঢুকলোর্তারা। গেঈ-এর হাত গ্যারীর মুঠের মধ্যে ধরা, বললো, কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

–না, কষ্ট আর কি। আর কতখানি যেতে হবে আমাদের?

–খুব একটা বেশি নয়, আপাততঃ কুড়ি কিলোমিটার, তারপরই জমিদারীর সীমানা ছাড়িয়ে যাবো আমরা। দেয়ালের ম্যাপটা আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি। এই পথটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত।

ফেনেল বারবার পিছিয়ে পড়ছে, যন্ত্রপাতির ব্যাগের ওজন বড় কম নয়। ফেনেল বললো, এই বোঝা কাঁধে চাপিয়ে হাঁটলে কোনদিনই সীমানা পেরিয়ে যাওয়া যাবে না। সে কি ভেবে নিয়ে ব্যাগটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, যাক, ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বেশ হাল্কা লাগছে এখন।

সূর্যের মুখ দেখা গেলো, ততক্ষণে তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। কাদা জল বাঁচিয়ে রোদের সেই অসহ্য তাপ মাথায় নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ধীরে ধীরে তারা এগোতে লাগলো,

ঘড়িতে এখন কাটায় কাটায় সাতটা বাজে, ভয়ে-আতঙ্কে ওরা গতিবেগ বাড়িয়ে দিলো।

জোন্স বলে উঠলো জলের গন্ধ পাচ্ছি যেন। নদীর কাছাকাছি এসে গেছি প্রায়।

আরো দশ মিনিট পর সত্যিই সত্যিই নদীর দেখা মিললো, নদীর পাড় চওড়া, পিচ্ছিল।

নদীটা পার হতে পারলে হতো। জোন্স বললো, খুব একটা গভীর বলে মনে হচ্ছে না। এমন কিছু চওড়া নয়, হেঁটেই পার হওয়া যেতে পারে। জুতো জামা খুলে সে মাটির ওপর জড়ো করে রাখলো। গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পা দিয়ে জল মাপার চেষ্টা করলো।

মনে হয় গভীর আছে।সাতরে পার হতে হবে।ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সেনদীর জলে, হাতের বড় বড় টানে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে গেল ওপারের দিকে।

হঠাৎ ঘটলো এক অঘটন, তিনজন এপারে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলো সবটুকু। বিপরীত পারের মাথাগুলো নড়ে উঠলো হঠাৎ। বাদামী রঙের একটা কিছু গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে অনেকটা মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো জলে ঠিক জোন্স এর সামনে। কাঁটা ভরা। লেজটা একবার জলের ওর প্রলম্বিত হলো মুহূর্তের জন্য। জো আর্তনাদ করে হাত পা ছেড়ে দিলো।

জলের নীচে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন, ঝটপটানি, ধীরে ধীরে জলের বাদামী রঙ পাল্টে প্রথমে ফিকে লাল, তারপর লাল, শেষে ঘন লাল হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো।

.

০৯.

দুপুরে বৃষ্টি নামলো। গত প্রায় দুঘণ্টা ধরে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে জমা হয়েছে আকাশে, সূর্য গেছে ঢেকে, চারিদিকে নেমেছে নিকষ কালো অন্ধকার। হঠাৎ বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো মেঘের গা বেয়ে। মুহূর্তের মধ্যে তিনজন ভিজে একাকার হয়ে গেলো।

গেঙ্গীর হাত ধরে গ্যারী ছুটলো জঙ্গলে একটু আশ্রয়ের জন্য। একটা বিরাট গাছের নীচে তারা দুজনে বসলো। ফেনেলও গালি দিতে দিতে এসে জুটলো। নদীর জল ক্রমশ বেড়ে চললো। গত চার ঘন্টা কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। জোন্স-এর আকস্মিক মৃত্যু সকলের মনে গভীর ছায়া ফেলেছে। কয়েকদিনের পরিচয়ে প্রত্যেকেই জোলকে ভালোবেসে ফেলেছিলো।

ক্ষণিকের জন্যও গেঙ্গী ভুলতে পারেনি সেই দৃশ্য। জোন্স এর মুখের সেই ভয়াবহ অভিব্যক্তি বুক ফাটানো আর্তনাদ। সর্বক্ষণ সেই ভয়াবহ দৃশ্য তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

দুঃখ গ্যারীরও কিছু কম নয়। কিন্তু এখন শোক প্রকাশ করার সময় নয়। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা মানে জুলুদের অনেকটা এগিয়ে আসতে সাহায্য করা। সুতরাং এখন থেমে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। সে তাই, না দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরতা গেঈ-এর হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের পথে।

তিনজনের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছে ফেনেল, জোন্সকে তার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

গাড়িটা খাদে গড়িয়ে পড়ার সময় তার ধৈর্য তার অমিত আত্মপ্রত্যয়–সবকিছু মুগ্ধ করে ফেলেছিলো ফেনেলকে। যেন মনে হয়েছিলো যে জোন্স তার কতদিনের বন্ধু।

গ্যারী মৃদুস্বরে গেঈকে বললো, বৃষ্টি হয়ে ভালোই হলো গেই, আমাদের পায়ের দাগ সব ধুয়ে মুছে যাবে এখন আর ওরা বুঝতে পারবে না আমরা কোন পথে এসেছি।

গেঈ উত্তরে শুধু হাত চেপে ধরলো গ্যারীর। শোকে-দুঃখে সে মুহ্যমান।

আরো মিনিট দশেকের পর বৃষ্টি কমে এলো। গ্যারী উঠে দাঁড়ালো আর এখানে নয়, এগোতে হবে আবার।নদীর পাড় ধরে তারা এগিয়ে চললো। ও পাড় ঘন-ঝোঁপ আর বড় বড় ঘাসে ঢাকা। কুমির লুকিয়ে থাকার আদর্শ আশ্রয়। জোন্স এর ঘটনা ঘটে যাবার পর ঝোঁপঝাড়ের কাছ দিয়ে আর নদী পার হওয়া ঠিক নয়। ফাঁকা মতো একটা জায়গা পেলে তবেই চেষ্টা করা যাবে একবার।

এবারে খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর আবার এগোবো।গ্যারী জোন্স-এররুকস্যাক খুলে খাবারের টিন বের করলো, সেদ্ধ মাংস খানিকটা, তিন জনের জন্য সমান ভাগ করলো সে।

গেঈ অলস সুরে বললো, আমার ক্ষিধে নেই, আমি খাবো না।

গ্যারী তাকালো তার দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলোমুখটা যেন কেমন সাদাটে, রক্তহীন, চোখ দুটো যেন বুজে আসছে।

গেঈ কিছু খেলোনা, গ্যারী আর ফেনেল ভাগ করে খেলো খাবারগুলো খেতে খেতে বারবার গ্যারী তাকালো গেঈর দিকে–গেই গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে চুপচাপ।

খাওয়া শেষ করে ওরা দুজন উঠে দাঁড়ালো। গেঈরকাঁধে হাত রেখে উঠতে বললোগারী। একরকম টেনেই তুলতে হলে তাকে শেষ পর্যন্ত।

কোনরকমে গ্যারী এবং গেঈ পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো, ফেনেলের পিছনে পিছনে। গ্যারী হাত ধরল তার।

ফেনেল ফিরলো তাদের দিকে। দোহাই তোমাদের একটু পা চালিয়ে এসো, কোনরকমে তারা দুকিলোমিটার গেলো, গেঈ আর পারছে না। যেন সে ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।

আরো তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর একটু বিশ্রামের জন্য একটা জায়গা পাওয়া গেলো নদী এখানে সামান্য সঙ্কীর্ণ,দুপাশে মাটির পাড়, অনেকদূর বিস্তৃত ঝোঁপঝাড় পাড় থেকে অনেক দূরে।

-এখানেই নদী পার হবো আমরা। গেঈকে সেএনোলো এক গাছের ছায়ায়, আরো একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে আসি-সঙ্গের জিনিসগুলো তো ভিজতে দেওয়া যায় না।

গ্যারী চলে যেতে ফেনেল আড়চোখে তাকালো গেঈর দিকে। রোদ এসে পড়েছেতার হাতের আংটিটার ওপর, হীরেগুলো যেন জ্বলছে। ফেনেলের চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে আংটিটা খুলে নেবার জন্য গেস্টর দিকে এগিয়ে গেলো।

গ্যারী সেই মুহূর্তে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো হাতে একটা ডাল নিয়ে। ফেনেল সরে গেল গেঈর কাছ থেকে।

জুতো এবং রুকস্যাকগুলো গাছের ডালে দ্রুত বাঁধা হলো। এসো, গেঈকে ডাকলো সে, ডালটা তুমি ধরে থাকবে, আমি ঠেলে নিয়ে যাবো।

দুজনে জলেনামলো, ফেনেল দাঁড়িয়ে রইলো পাড়ে।কই, এবার তোকুমির এলোনা! ওপারে গিয়ে কাদার ওপর বসে পড়লো গেই। ফেনেল জলে নেমে ভয়ে আতঙ্কে দ্রুত সাতরে নদী পার হলো। গ্যারী ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে গেঈর অচেতন প্রায় মুখের ওপর।

ফেনেলের গা বেয়ে জল ঝরছিল টস্ টস্ করে। কর্কশ গলায় সে বললো, কি ব্যাপার তোমাদের?

–দেখতেই তো পাচ্ছো, গ্যারী অচেতন গেইকে পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলো এক গাছের ছায়ায়, জুতো আর রুকস্যাকগুলো নিয়ে এসো।

ফেনেল নিঃশব্দে আদেশ পালন করলো।

গ্যারী বললো, দুটো ডাল পাওয়া যায় নাকি দেখো, স্ট্রেচারের মতো করে বরং ওকে নিয়ে যাবো।

–তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি।ওকে বয়ে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি বয়ে নিয়ে যাও, আমি পারবো না।

গ্যারী কঠিন চোখে তাকালো তার দিকে, তার মানে তুমি বলতে চাও, ওকে এখানে ফেলে রেখে যাবো?

আলবাত, কেন যাবো না? ও আমাদের কে যে এত দরদ দেখাতে হবে? চলো সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

গ্যারী বললো, তুমি যাও, ওকে ফেলে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

বেশ, কম্পাস আর আংটিটা দাও আমাকে। আমি যাচ্ছি।

বেরিয়ে যাও–কোনটাই পাবে না।

ফেনেল সবল হাতে ঘুষি ছুড়লো গ্যারীর দিকে, গ্যারীও ফেনেলের চোয়ালে ঘুষি মারলো। আঘাত সামলাতে না পেরে ফেনেল চিত হয়ে পড়লো মাটিতে।

ফেনেল মাটি হাতড়ে তুলে নিলো একটা পাথর–মাথার কাছেই মাটিতে গেঁথে ছিলো সেটা নিমেষে ছুঁড়ে মারলো গ্যারীর মাথা লক্ষ্য করে। আচমকা আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলো না গ্যারী। চোখ ধাধিয়ে গেলো তার–অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

ফেনেল বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ালো, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো গ্যারীর দিকে, পকেট হাতড়ে কম্পাসটা বার করে নিলো। এবার সে এগিয়ে গেলো গেঙ্গী-এর দিকে, এক ঝটকায় তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিলো। তারপর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললল, চললাম কম্পাস আর আংটি নিয়ে, এখানে দুজনে মবো। জুলুদের হাতে না পড়লেও শকুন তোমাদের টুকরে খাবে।

আর দেরী না করে অবশিষ্ট খাবারের রুকস্যাকটা তুলে নিলোকাঁধে, তারপর দুজনের উদ্দেশ্যে থুতু ছিটিয়ে এগিয়ে চললো অন্ধকার জঙ্গলের দিকে।

অনেকক্ষণ পর গ্যারীর জ্ঞান ফিরলো। একটা ছায়া সরে গেলো, তারপর আর একটা, আরও একটা, মাথার ওপর গাছের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলো সে। পাতার আড়ালে দুটো শকুন। গ্যারীর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেলো।

গ্যারী সার্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো কম্পাস নেই। বহু কষ্টে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো গেঙ্গী-এর সামনে, গেঙ্গী-এর চোখ মুখ রক্তাভ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অনড়, অচল হয়ে পড়ে আছে একই রকম ভাবে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল থেকে আংটিটা অদৃশ্য।

বসে পড়লো সে গেঙ্গী-এর পাশে। আরো ষাট কিলোমিটার জলাভূমি পেরোলে তবেই সেই শহরটাতে পৌঁছানো সম্ভব। খাবারের রুকস্যাকটা নেই, জলও নেই। ফেনেল সব সঙ্গে নিয়ে গেছে।

ঘড়িতে এখন বিকেল চারটা, গেঙ্গীকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে। এই নির্জন বনভূমিতে কি করবেই বা সে ওকে নিয়ে, কার কাছে সাহায্য চাইবে!

ধীর ধীরে চোখ মেললো গেঙ্গী, গ্যারী জানালো যে, কম্পাস আর আংটি নিয়ে ফেনেল চলে গেছে।

জানি, তুমি কিছু ভেবো না। গেঙ্গী গ্যারীর হাতটা তুলে নিলো তার হাতের মধ্যে।

হঠাৎ একটা শব্দে দুজনেই মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলো একটা শকুন মগডাল থেকে নেমে এসেছে নীচের ডালে-গলা বাড়িয়ে আছে।

গ্যারী রক্তাক্ত পাথরটা হাতে তুলে নিলো, ছুঁড়ে মারলো ডাল লক্ষ্য করে। শকুনটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেলো।

ও বুঝতে পেরেছে আমি মরতে বসেছি। আমি আর বাঁচবোনা গো, তুমি বরং চলে যাও এখান থেকে–আমার জন্যে তুমি কেন জুলুদের হাতে প্রাণ দিতে যাবে? কি যে হলো আমার বুকটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, পা দুটো কি ঠাণ্ডা মাথাটা ভারী হয়ে আছে, উঃ!

গ্যারী গেঈর পায়ে হাত দিলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার পা, বললো, তা বলে আমি তো তোমাকে ফেলে যেতে পারি না।

গ্যারী মনে মনে ভাবলো তাহলে গেঈ কি বাঁচবে না? এই ঘন জঙ্গলে গেঈ পাশে থাকলে তবুও সাহসে ভর করে এগোনো সম্ভব, কিন্তু একা একা!

এই অবস্থায় ভগবানকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে গেঈ-এর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, দেখো, আমি বলছি তুমি ঠিক সেরে উঠবে।

এমন সময় গাছের ডালে আবার শব্দ শকুনটা আবার এসে বসেছে।

গেঈ গ্যারীর একটা হাত চেপে ধরে বললো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে? আমি আর বাঁচবো না, মরার আগে আমি উইল করে যেতে চাই, তুমি আমাকে বলেছিলে–সব কিছু টাকার ওজনে মাপতে নেই। ঠিকই বলেছিলে তুমি, টাকাকে যদি বড় করে না দেখতাম তাহলে হয়তো এখানে এসে এরকম ভাবে মরতাম না। তোমার কাছে কাগজ কলম আছে গ্যারী?

গেই অসহায়ের মতোকাঁদতে শুরু করলো, গ্যারী-তুমি তো বুঝতে পারছেনা, কথা বলতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে লক্ষ্মীটি আমার, আমাকে উইল করতে দাও, দোহাই তোমার!

রুকস্যাক হাতড়ে একটা নোটবুক আর পেন বের করলো গ্যারী।

–উইলটা নিজের হাতেই লিখবো। সুইস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার হাতের লেখা চেনেন। গেঈ বহু কষ্টে সোজা হয়ে চিঠিটা লিখতে লাগলো। লেখা শেষ করে গ্যারীর হাতে দিলো সে নোটবুকটা।

আমার সব সঞ্চয় তোমাকে দিয়ে গেলাম গ্যারী, বার্ন-এ আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় এক লক্ষ ডলার জমা আছে। ডঃ ফাস্ট সেখানকার ডাইরেক্টর। ওঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলো তুমি। কিভাবে আমরা এখানে এলাম, আমার কি হয়েছে, কালেনবার্গের মিউজিয়ামে কি কি আছে কিছু যেন বাদ দিও না। যা করার সব তিনি করবেন। এই উইলটা তাকে দিও, তিনি তোমাকে সব কিছু দেবার ব্যবস্থা করবেন।

–আচ্ছা সে সব হবেখন। তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো দেখি।

গ্যারী মুখ নামিয়ে তপ্ত চুম্বন এঁকে দিলো গেঈর ঠোঁটে।

আরো তিন ঘণ্টা পর। সূর্য তখন দিনের শেষ আভা মেলে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। গেই মারা গেলো, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা তাঁর বা গ্যারীর

কারুর নজরে পড়লো না। পড়লে বুঝতে বার্জিয়া আংটি তার বিষের ছোঁয়ায় আরও একটি প্রাণ হরণ করলো।

.

গত দুঘণ্টা ধরে সমানে হাঁটছে ফেনেল, রোদের সেই প্রচণ্ড তেজ, বনের সেই গভীর নিস্তব্ধতা এবং সর্বোপরি সেই নির্জন একাকীত্ব তার বিশ্রী লাগছিল। তবু সান্ত্বনা এই যে-সীমানার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে সে। সীমানা পার হতে পারলেই তার সমস্ত কষ্টের শেষ হবে। হাজার ভাবনা তার মনে ভিড় করলো।

স্যালিকের অফিসে গিয়ে যখন আংটি দেখাবো কি অবস্থাই না হবে! স্যালিক যদি ভেবে থাকে নহাজার ডলার দিলেই আংটিটা তার হাতে পৌঁছবে তবে মূর্খতারই পরিচয় দেবে সে। আগে স্যালিক আমাকে চারজনের ফি বাবদ মোট ছত্রিশ হাজার ডলার দেবে–তবেই পাবে সে আংটিটা। তারপরনগদ ছত্রিশ হাজার ডলার পকেটে নিয়ে সোজানাইমস-এ। একটু নিরিবিলিতে না বেড়িয়ে এলেই নয়।

গেঙ্গ আর গ্যারী গেছে-আপদ গেছে। উচিত শাস্তি হয়েছে। মরুক ওখানে পড়ে পড়ে।

সূর্য আস্তে আস্তে ঢলে পড়েছে। তার একটা রাতের আস্তানা খুবই দরকার। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মনের মত একটা জায়গা মিললো। হেলান দিয়ে বসা যাবে বেশ। তাছাড়া বৃষ্টি এলে মাথা বাঁচানোও যাবে।

ক্ষিধে পেয়েছে বেশ। রুকস্যাক থেকে মাছ ভাজার টিনটা খুলে বসলো সে। শুকনো কাঠপালা জোগাড় করে আগুন জ্বাললো।

রাতের অরণ্য জেগে উঠলো ধীরে ধীরে। কোথাও মৃদু শব্দ কোথাও পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়োবার শব্দ। গাছের ওপর বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি।বাঁদরের কিচিরমিচির-সবমিলিয়ে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর–পরিবেশ।

ফেনেলের চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। চোখ বুজলো সে। মুহূর্তে সমস্ত বনভূমির যাবতীয় শব্দ সরব হয়ে উঠলো তার কানের পর্দায়। ভয়ে আতঙ্কে চোখ মেলে আগুনের আভায় দূরের ঝোঁপঝাড়ের দিকে তাকালো। জুলুরা আবার আগুন দেখে ধরে ফেলবেনা তো! ফেনেলের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে গেলো একটা। না, আগুন জ্বালাটা বোকামি হয়েছে। দূর থেকেই আগুন চোখে পড়ে। সে আর দেরী না করে আগুন নিভিয়ে দিল। কালো চাদরের মতো অন্ধকার নেমে এল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে জেগে রইলো। এক একটা শব্দে চমকে চমকে উঠলো বারবার। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো ফেনেল। কেমন একটা আতঙ্ক পেয়ে বসেছে তাকে। বিপদের গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে। বিপদে সতর্ক হবার এক সহজাত প্রবৃত্তি তার আছে। সেই প্রবৃত্তিটাই যেন তাকে ঘুম থেকে তুলে দিলো।

কে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে মোটা লাঠিটা পেলো সে–শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

টর্চের কথা তার এতক্ষণ মনেই ছিলো না। পাশেই রেখে দিয়েছিলো। নিমেষে টর্চটা তুলে সুইচ টিপলো সে।

আলো গিয়ে সোজা পড়লো জন্তুটার গায়ে। মুখটা শেয়ালের মতো, বসার ভঙ্গীতে শিকারী কুকুরের ক্ষিপ্রতা, শিউরে উঠলো ফেনেল। হায়নাটা আর একটু হলে লাফিয়ে পড়তো তার উপর।

আলো দেখে জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলো। ফেনেল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। টর্চের আলোটা আর একটু দূরে ফেললো সেদুটো জ্বলজ্বল চোখ ঝোঁপের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

ঘড়িতে তিনটে বাজে, আর ঘুম নয়। আর এক ঘণ্টা পর মোটামুটি আলো ফুটবে। এই এক ঘণ্টা জেগে থাকাই ভালো। আবার বসলো সে মাটিতে। হেলান দিলো গাছে।

হঠাৎ রাত্রির নীরবতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ভেসে এলো এক উচ্চ হাসির শব্দ–হি হি হি হি ।

রক্ত হিম করা উন্মত্ত সেই হাসি। ফেনেলের চুল খাড়া হয়ে উঠলো, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। আবার শোনা গেলো সেই হাস্যরোল হি হি হিহি হিহি–ক্ষুধার্ত হায়নাটা ডাকছে।

দুঃখে হতাশায় চোখ ফেটে জল এলো ফেনেলের, বাকি রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দিল সে।

ধীরে ধীরে আলো ফুটলো। ফেনেলের শরীর অশক্ত, পেশীতে অসহ্য যন্ত্রণা। সারারাত ঠায় বসে কেটেছে, এখন একটু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এখন বিশ্রাম করার সময় নেই।

হাঁটতে শুরু করলো ফেনেল। মন্থর গতিতে কোনোক্রমে অশক্ত শরীরটাকে নিয়ে চললো টানতে টানতে। ঘণ্টা দুই হাঁটার পর এক গাছতলায় বসে পড়লো সে। টিন খুলে খাবার খেলে, জলের বোতল থেকে জল খেলল একটু। আবার হাঁটতে শুরু করলো। আরো খানিকটা এগিয়ে কম্পাস বের করলো সে। একি! এগগাবার কথা দক্ষিণ দিকে অথচ সে এগোচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমে। কখন ঘুরতে ঘুরতে ভুল পথ ধরে ফেলেছে সে। বড় বড় ঘাস, জলা জমি–কোথায় সাপ-খোপ লুকিয়ে আছে কে জানে!

তবু না গেলে উপায় নেই। হাতের লাঠি দিয়ে ডালপালা, ঘাস ঝোঁপঝাড় সরাতে সরাতে সে এগোলো। সমস্ত শরীর বেয়ে তার ঘাম ঝরছে। অসম্ভব রোদের তেজ। একটু বিশ্রামের ভীষণ দরকার এখন।

ঘুমোলে মন প্রাণ অনেক তাজা হবে। দেহে নতুন শক্তি আসবে। দিনের বেলা তো আর হায়না নেই, শুধু জুলুদের নিয়েই যা ভয়।

মনের মতো জায়গা সে একটা খুঁজে বের করলো।

বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি, মাঝখানটা ফাঁকা। সে শুয়ে পড়লো। রুকস্যাক দিয়ে বানালো মাথার বালিশ। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মোচন করতে তার চোখ ভরে নামলো নিশ্চিন্ত ঘুম।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে হায়নাটা বেরিয়ে এসে ঘুমন্ত ফেনেলকে দেখলো, দুদিন ধরে সে উপোসী, শিকার জোটাতে পারে নি। তাই মরিয়া হয়ে দিনের আলোয় বেরিয়েছে। ফেনেলের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার আর ফেনেলের ঘুম ভাঙলো না। এত ক্লান্ত এত পরিশ্রান্ত সে যে বিপদে সতর্ক হবার সহজাত প্রবৃত্তি তার হারিয়ে গেছে। হায়নাটা দীর্ঘ আধঘণ্টা অপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো। পেছনের দুপায়ে ভর করে একবার শরীর তুললো তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়লো ফেনেলের ডান পায়ের হাঁটুর ওপর।

নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো ফেনেল, ঘুম ভাঙলো তার, উঠতে চেষ্টা করলো কয়েকবার, কিন্তু পারলোনা। ঘাড় কাত করে তাকালো পায়ের দিকে হাঁটুর মালাইচাকিটা উধাও। রক্তে মাখামাখি হয়ে কয়েক টুকরো সাদা হাড় পড়ে আছে সেখানে।

যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে চারিদিকে তাকালো ফেনেল। দৃষ্টি স্থির হলো হায়নাটার ওপর। সে পরম তৃপ্তিতে চিবোচ্ছে তার হাড়-মাংস। গল গল করে রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে, ব্যথায় কুঁকড়ে গেলো ফেনেলের শরীর।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সে চীৎকার করে উঠলো। কে আছো বাঁ-চা-ও।

সেই গভীর ঘন অরণ্যেতার বুকফাটা আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে একসময় হারিয়ে

ফেনেল আর একবার চীৎকার করার চেষ্টা করলো। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো এবার, যন্ত্রণা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত শরীরে। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা অবলুপ্ত হয়ে এলো।

ফেনেল নিঃশব্দে শুয়ে রইলো, নড়াচড়ার শক্তি তার নেই। যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে সে তাকালো আকাশের দিকে। একদল শকুন ঘাড় উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হায়না ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এলো আবার পেছনের দুপায়ে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ফেনেলের পেটের উপর–তী দাঁতের আঘাতে বের করে আনলো সমস্ত নাড়িভুড়ি। তীব্র যন্ত্রণায় ফেনেল চীৎকার করে উঠলো, এ তার শেষ আর্তনাদ–সেই আর্তনাদ আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো।

বনে জঙ্গলে কম দিন কাটলো না নোগুমেন-এর। কালেনবার্গ-এর জমিদারীতে কাজ করার সময় জঙ্গল পাহারা দিতে হতো। চাকরিটা তার নিজের দোষেই গেছে। সে যাই হোক, এখন সে জঙ্গলেই ফিরে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। দক্ষিণ দিকে নদীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় নিয়ত। সাপ মারে, কুমির মারে। চামড়া নিয়ে যায় মেনভিলেদাম ভালোই পাওয়া যায়।

সেদিন দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের পথ ধরে এগোচ্ছিলো সে সন্তর্পণে নদীর দিকে। থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে উঠলো কাতর গলায়। বহুদিনের পুরোনো রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে সে এগোলো শব্দ লক্ষ্য করে। দৃষ্টি স্থির হলে

গাছটার নীচে-ফেনেলের শরীরের অবশিষ্ট অংশটুকু নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি করছে দুটো শকুন।

.

ধীর মন্থর গতিতে গ্যারী এগিয়ে চললো নদীর পাড় ধরে। রোদের অসহ্য তাপ, সাবধানে সন্তর্পণে পায়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে এগোতে লাগলো।

কম্পাস ছাড়া সীমানা পার হবার চেষ্টা অসম্ভব–পায়ে পায়ে–বিপদের সম্ভাবনা। জঙ্গলের পথনা ধরে তাই সেনদীর পাড় ধরেই এগিয়ে চলেছে। নিরাপদে সীমানা পার হয়ে ছোট শহরটিতে ঢোকার এইটাই একমাত্র পথ। অবশ্য অসুবিধা যে নেই তা বলা যায় না। কুমিরে টেনে না নিয়ে গেলেও জুলুদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবু ভবিষ্যৎ না ভেবে গ্যারী ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এগিয়ে চলেছে।

গেঙ্গীকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সে রাতের মতো আর এগোয়নি গ্যারী। দুঃখে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছিলো জঙ্গলের একটা নিরাপদ জায়গা বেছে। বন্য-জন্তুর দুশ্চিন্তা সে একেবারেই করেনি। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছে। ঘুমের মধ্যে বার বার গেঙ্গী-এর ক্লান্ত রোগাক্রান্ত মুখটা ভেসে। উঠেছে।

ভোর পাঁচটা থেকে সে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তার বুক একেবারে শুকিয়ে গেছে। সম্বলের মধ্যে আছে চার প্যাকেট সিগারেট, একের পর এক তাই খেয়ে চলেছে।

হিসাব মতে ফেনেল-এর এতক্ষণে মেনভিল থেকে জোহান্সবার্গে রওনা হবার কথা। সেখান থেকে সোজা লন্ডনে পৌঁছে স্যালিককে আংটিটা দিয়ে টাকা হাতিয়ে আর কি দাঁড়াবে। সেখানে!

সে আরো ভাবতে লাগলো যে, আংটিটা একবার স্যালিক-এর হস্তগত হলে তার হাত দিয়ে কি আর জল গলবে! গ্যারীকে কি আর দেবে সেন হাজার ডলার। সে যাই হোক না দেয় বয়েই গেলো। একবার ইংল্যান্ডে যেতে পারলেই হয়–গেঙ্গী-এর এক লাখ ডলার তুলে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটবে তার। ইলেকট্রনিক্স-এর ট্রেনিংটা শেষ করে একটা কোম্পানি খুলে বসতে তার বেগ পেতে হবে না।

দুপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করলো গ্যারী। সন্ধ্যে পর্যন্ত পঁচিশ কিলোমিটার যেতে পারলো সে। এখনো তার তিরিশ কিলোমিটার পথ যেতে বাকি। জঙ্গলের পথনা ধরে নদীর পাড় দিয়ে এগোনো অনেক সোজাই হয়েছে বলতে হবে। এতে পথ হেঁটে এখন সে ক্লান্ত বোধ করছে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন তার।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে নিরাপদ একটি জায়গা বেছে শুয়ে পড়লো সে। ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙতে আবার সে চলতে শুরু করলো। একটু গতিবেগ বাড়ালে আজ জমিদারীর সীমানা ছাড়িয়ে ছোট শহরটিতে ঢুকতে পারবে সে।

সামনে একটা বাঁক।নদীটা মোড় নিয়েছে ডাইনে। অন্যমনস্ক ভাবে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। ওটাকি!নদীর পাড়ে আটকে আছে! ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গ্যারী

সেইদিকে দৌড়োলো। ছোট্ট একটা ডিঙি। উল্লাসে আনন্দে বা শক্তি রহিত হলো তার। ডিঙির পাটাতনে পড়ে আছে এক জুলু। লোকটা বেঁচে নেই। মারা গেছে।

জুলুর ডান হাতের দিকে নজর পড়তেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সে। তার ডান হাতের তর্জনিতে গাছের পাতার আড়াল থেকে বোদ পড়ে ঝিঁঝিক্ করে উঠছে বার্জিয়া আংটির হীরেগুলো।

.

লন্ডনের বিমান বন্দরে শুল্ক বিভাগের নিয়ম কানুন সেরে বেরিয়ে গ্যারী আর দাঁড়ালো না, সোজা গিয়ে ঢুকলো টেলিফোন ঘরে। টনিরনম্বর ডায়াল করলো। সকাল সাড়ে দশটা হতে চললো টনির কি ঘুম ভেঙেছে এখন। কয়েক মিনিট পর ওপাশ থেকে ঘুমে জড়ানো টনির স্বর ভেসে এলো। গ্যারীতাড়াতাড়ি বললো,টনি, আমি গ্যারীকথা বলছি। আমি এই মাত্র নেমেছি জোহান্সবার্গ এর প্লেন থেকে।

তাই নাকি! আনন্দে-উল্লাসে টনি বোধহয় উঠে বসলো বিছানায়, গ্যারী ডার্লিং–আমি ভেবেছিলাম, সেই মেয়েটা বোধ হয় তোমাকে এতদিনে তুকতাক করে ফেলেছে...

বাদ দাও ওসব। শোনন, আগামীকাল আমি বার্ন-এরওনা হবো, তুমি থাকবে আমার সঙ্গে বুঝলে?

-কতদিন থাকবে ওখানে?

বার্ন-এ দিন কয়েক, ওখান থেকে যাবো ক্যাপরিতে, হপ্তা দুয়েক থাকবে সেখানে-স্রেফ বেড়াবো।

–যদিও যেতে ভীষণ ইচ্ছা করছে, কিন্তু যাই কিভাবে। বড় জোর দিন তিনেকের ছুটি আদায় করা যাবে। তাই বলে এতদিন। কাজকর্ম তো করতে হবে, না কি?

যাই হোক, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তোমার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি আমি। সে ফোন ছেড়ে দিলো।

একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র নিয়ে উঠে বসলো গ্যারী। ড্রাইভারকে রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেলে যেতে বললো।

মালপত্র দারোয়ানের কাছে রেখে সেখান থেকে স্যালিককে খবর পাঠিয়ে ওপরে উঠেস্যুইটের দরজা ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকলো গ্যারী। সোনালী চুলের একটি মেয়ে স্যালিকের কামরার দরজা খুলে দিলো।

গ্যারী ঘরে ঢুকলো। স্যালিক বসেছিলেন তার ডেস্কে–মুখে সিগার, থলথলে হাত দুটো টেবিলের ওপর ন্যস্ত।

সুপ্রভাত মিঃ এডওয়ার্ডস। তিনি গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আংটিটা এনেছেন?

–এনেছি। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসলো গ্যারী।

–এনেছেন, ধন্যবাদ। আর তিনজন? তারা কোথায়? কখন আসছেন তারা?

–তাঁরা আর আসবেন না। তারা কেউ বেঁচে নেই, সবাই মারা গেছে।

মারা গেছেন! চোখ ছোট ছোট হলো স্যালিকের, মিস্ ডেসমন্ডসে ও?

–হ্যাঁ সকলেই মারা গেছে।

স্যালিক অধৈর্য হলেন, আর দুজন সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, কি হয়েছিলো গেঈর?

–খুব সম্ভবত কালাজ্বর–জঙ্গলে পোকামাকড় হাজারো রকমের–মারা গেলেন শেষে।

স্যালিক নিঃশব্দে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গেঈর মৃত্যু সংবাদ তাকে বড় আঘাত দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর তিনি গ্যারীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, কি করে বুঝবো যে আপনি সত্যি কথা বলছেন? বাকি দুজন কিভাবে মরলেন?

বিশ্বাস করা, না করা আপনার মর্জি, মিঃস্যালিক, গ্যারীঅন্য দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, জোন্স কুমিরের পেটে গেছে আর ফেনেলের কি হয়েছে সঠিক বলতে পারি না। খুব সম্ভবত সে মরেছে এক জুলুর হাতে। ফেনেলের রুকস্যাক এবং আংটিটা নিয়ে জুলুটাকে আমি মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। ফেনেল আংটি আর কম্পাস নিয়ে আমাকে আর গেইকে ফেলে একলাই এগিয়ে গিয়েছিল। আমি বেঁচে ফিরে আসলেও গেঈ ফিরতে পারে নি।

স্যালিক চেয়ারে বসে পড়লেন। ভিজে হাতের তালু রুমালে মুছলেন। গেঙ্গির জন্য দশ লক্ষ ডলারের একটা কাজ হাতছাড়া হয়ে গেলো তার। ভেবে রেখেছিলেন,ফিরে এলেই কাজটা করাবেন তাকে দিয়ে। দুঃখের বদলে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেলো তার।

কই আংটিটা দিন।

গ্যারী পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করে ঠেলে দিলো স্যালিক-এর দিকে। স্যালিক আংটিটা বাক্স থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তৃপ্তিতে মন ভরে উঠলো তার। সেফ মাথা খাঁটিয়ে চারটে লোককে দাবার খুঁটির মতো চালিয়ে পাঁচ লক্ষ ডলার রোজগার-এ কম কথা নয়।

আংটিটা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুললেন স্যালিক, ঝামেলা যে আপনাদের কম পোয়াতে হয়নি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমার। যাই হোক, আপনারা আমার জন্য যে কষ্ট করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে ঠকাবো না আমি। পুরস্কার হিসাবে আপনার ফি দ্বিগুন করে দেবো। তার মানে আপনি পাবেন মোট আঠারো হাজার ডলার, খুশি তো?

গ্যারী মাথা নাড়লো, দরকার নেই,নহাজার যথেষ্ট। আপনার টাকা যত কম নিতে পারি, ততই মঙ্গল।

স্যালিক এক মুহূর্ত গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একটা লম্বা খাম বের করে ছুঁড়ে দিলেন গ্যারীর দিকে।

গ্যারী খামটা তুলে নিলো–গুণে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলো না। বুকপকেটে খামটা রেখে চেম্বার ঠেলে উঠেদরজার দিকে এগোলো, তারপর সোজা গিয়ে লিফটের বোতাম টিপলো। টনিকে দেখবার জন্য তার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

স্যালিক বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গেঈ-এর জন্য মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। তবু ভালো, মেয়েটার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে অকারণ ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। মেয়েটা তার জীবনে এসেছিলো, যতদিন বেঁচে ছিলো উপকারই করেছে। এখন নেই যখন আর চিন্তা করে লাভ নেই।

আংটিটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরালেন টেলিফোনের। হীরেগুলো চমৎকার-ওপাশে টেলিফোন বাজলোতর্জনীতে তিনি আংটিটা গলিয়ে নিলেন–উঃ, ছুঁচের মত কি যেন একটা বিধলোতাড়াতাড়ি আংটি খুলে টেবিলে রেখে দিলেন তারপর আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে–ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং-উঁচটায় তাহলে এখনও আঙুল ছড়ে রক্ত পড়ে–আঙুলটা নিয়ে তিনি জিভ দিয়ে চুষতে লাগলেন– ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং-টেলিফোন বেজেই চলেছে–চারশো বছরের পুরনো বিষটা এতদিনে নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে–ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং–মার্সিয়েল কি বাড়ি নেই..রক্তটা এখনও ঝরছে, আবার তিনি আঙুলটা মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে লাগলেন। ক্রি-রি-রিং...ক্রি-রি-রিং টেলিফোন বেজেই চললো তিনি ভাবতে লাগলেন যে–আংটিটা পাওয়া গেছে এই আনন্দের সংবাদ শুনে মার্সিয়েল কি খুশিই না হবে!